জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত *ধূর্তসমাগম* প্রহসনের সমীক্ষাত্মক আলোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

(এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ)

গবেষিকা

রাখী নন্দী

ক্রমিক সংখ্যা – **MPSA194001**

শিক্ষাবর্ষ – **২০১৭-২০১৯**

রেজিস্ট্রেশন নং – **102561**, বর্ষ – **2007-2008**

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ডঃ দেবার্চনা সরকার

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ (কলা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০১৯

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

Certified that the thesis entitled, জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত ধূর্তসমাগম প্রহসনের সমীক্ষাত্মক আলোচনা, submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in SANSKRIT of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at JADAVPUR UNIVERSITY, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

RAKHI NANDI
ROLL NO. – MPSA194001
REG. NO. – 102561 (2007-2008)

(Name/or signature of the M.Phil Student with
Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of RAKHI NANDI entitled জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত ধূর্তসমাগম প্রহসনের সমীক্ষাত্মক আলোচনা, is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in SANSKRIT of Jadavpur University.

Ashok Kumar Mahata 14.05.19
Head
Department of Sanskrit
Associate Professor & Head
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Debarchana Sarkar 14.05.19
Supervisor & Convener of RAC
Professor, Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata- 700032

Shiuli Basu 17/5/19
Member of RAC
Associate Professor
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধীনে গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য ও গর্বিত। আমার গবেষণার বিষয় "জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত *ধূর্তসমাগম* প্রহসনের সমীক্ষাত্মক আলোচনা"। এম.ফিল পরীক্ষার একটি অবশ্য করণীয় অঙ্গ হিসাবে এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রণয়ন করা। পুঁথি নিয়ে গবেষণা করার অভিপ্রায় বহুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে ছিল। পুঁথিবিদ্যার ছাত্রী না হয়েও পুঁথি নিয়ে গবেষণা করার অভিপ্রায় আমার তত্ত্বাবধায়িকা পরম পূজনীয়া অধ্যাপিকা ডঃ দেবার্চনা সরকার মহাশয়ার কাছে প্রকাশ করি। তারপর থেকে গবেষণা সন্দর্ভের যাবতীয় কাজে তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে সাহায্য করেছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তিনি কাজ শুরু করার আগে থেকেই নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ মত গ্রন্থপাঠ করেছি ও নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্ম অব্যাহত রেখে দৈহিক ক্লেশকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন তিনি আমার জন্য পরিশ্রম করেছেন। তিনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন কিভাবে পুঁথি নিয়ে গবেষণা করতে হয়। ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার অধ্যাপিকাকে ছোট করতে পারি না। তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলাম। তাঁর স্নেহ যেন এইভাবেই আমার উপর বর্ষিত হয় এই প্রার্থনা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। ছোটবেলা থেকে যে সমস্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে, শিক্ষক, শিক্ষিকার কাছে পাঠগ্রহণ করেছি তাঁদের সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গ্রন্থাগারের যে সমস্ত কর্মীদের কাছে সাহায্য পেয়েছি তাদের উপর আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা কর্মে যে সমস্ত বন্ধু ও বন্ধুস্থানীয়দের কাছে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসা রইল। যারা প্রিন্ট ও বাঁধাই করতে সাহায্য করেছে তাদের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার বাবা ভরত নন্দী, মা রীনা নন্দী, শাশুড়ি-মা সন্ধ্যা চৌধুরী ও স্বামী শুভেন্দু চৌধুরী, যাঁদের উৎসাহ ছাড়া এই গবেষণা সন্দর্ভ রচনা সম্ভব হত না। তাঁদের উপর আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। এছাড়াও পরিবারের বাকী সদস্যদের আমার প্রণাম জানাই যারা সর্বদা পাশে থেকে আমাকে সাহস যুগিয়েছেন।

রাখী নন্দী

গবেষিকা

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

সূচীপত্র

বিষয়সূচি		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
	ভূমিকা	১-৬
	প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়		
	সম্পাদিত মূলপাঠ	৮-৩২
তৃতীয় অধ্যায়		
	অনুবাদ	৩৩-৫৭
চতুর্থ অধ্যায়		
	সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রহসনের স্থান	৫৮-৬৫
	চতুর্থ অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী	৬৬-৬৭
পঞ্চম অধ্যায়		
	নাট্যতত্ত্বের আলোকে ধূর্তসমাগম প্রহসনের বিশ্লেষণ	৬৮-৮৭
	পঞ্চম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী	৮৮-৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়		
	সামাজিক প্রেক্ষাপট	৯৩-১০১
	ষষ্ঠ অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী	১০২
সপ্তম অধ্যায়		
	উপসংহার	১০৩-১০৪
	গ্রন্থপঞ্জী	১০৫-১০৭

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সামাজিক জীবনে হাস্যরসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই সাহিত্যেও এই রস প্রাচীনকাল থেকেই সমাদর লাভ করেছে। স্বভাবতঃ আলংকারিকরাও এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে শাস্ত্রে একে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। অস্বাভাবিক পোশাকপরিচ্ছদ, অলঙ্কার, প্রসাধন, বিকৃত লালসা, পারস্পরিক কলহ, অপ্রাসঙ্গিক বাক্যালাপ ইত্যাদির মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশিত হয়। সমাজের ছোট থেকে বড়ো সবশ্রেণীর মানুষেরাই হাস্যরসকে উপভোগ করতে পারে। সব ধরণের স্বাভাবিক মানুষই হাস্যরসকে উপলব্ধি করতে পারে, তাই জীবন ও সাহিত্যের দিক দিয়ে এই রস গুরুত্বপূর্ণ। আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে হাস্য দু রকমের হতে পারে – আত্মস্থ ও পরস্থ। নিজের বিকৃত বেশবিন্যাস বর্ণনা করে বা দেখে হাস্যের উদ্রেক ঘটলে তা হয় আত্মস্থ হাস্যরস। আর অপরের বিকৃত বেশভূষা দেখে বা বিকৃত বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণ করে হাস্যের উদ্রেক হলে তাকে বলা হয় পরস্থ হাস্যরস।[১] হাস্যের স্থায়িভাব হল হাস। এই হাস নামক স্থায়িভাবের আশ্রয় ত্রিবিধ ব্যক্তি – উত্তম, মধ্যম এবং অধম। এইভাবে আত্মস্থ ও পরস্থ হাস্যরস আশ্রয়ভেদে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যে হাস্যে নেত্র ঈষৎ বিকশিত হয় তা হল স্মিত শ্রেণীর হাস্য, যাতে দন্ত কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় তার নাম হসিত শ্রেণীর হাস্য, মধুরস্বর যুক্ত হাস্যকে বলা হয় বিহসিত, যে হাস্যে মস্তক কম্পিত হয় তা হল উপহসিত হাস্য, যে হাস্যে চোখে জল আসে তা হল অপহসিত শ্রেণীর হাস্য এবং যে হাস্যে অঙ্গের বিক্ষেপ ঘটে তা হল অতিহসিত শ্রেণীর হাস্য। এদের মধ্যে প্রথম থেকে যথাক্রমে দুটি করে হাস্য উত্তম,

মধ্যম এবং অধম প্রকৃতির ব্যক্তিগণের হয়ে থাকে।[২] হাস্যরস যদি তির্যক ব্যঙ্গকে আশ্রয় করে প্রকাশ করা যায় তাহলে তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। সমাজের উচ্চপদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন নানারকম অপকর্মে ব্যাপৃত হন, সমাজে যখন মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে তখনই জন্ম নেয় ব্যঙ্গপ্রধান হাস্যরসবিশিষ্ট প্রহসন।

আচার্য ভরত বলেন যে শৃঙ্গারের যে অনুকরণ তাই হাস্য নামে অভিহিত।

শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।[৩]

এই হাস্যের স্থায়িভাব হল হাস। এই হাস থেকেই প্রহসন তৈরি হয়েছে। আসলে প্রহসন হল নাটকের প্রাচীনতর রূপ এবং ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* পূর্বেও প্রহসনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ভরতের মতানুযায়ী সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম ও অতি জনপ্রিয় হল প্রহসন জাতীয় কাব্য।

সর্বলোকং প্রহসনৈর্বাধন্তো হাস্যসংশ্রয়ৈঃ।[৪]

সময়ের নিরিখে প্রহসন জাতীয় দৃশ্যকাব্যগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়–

ক) আদিযুগের প্রহসন (খ্রি. দশম শতকের পূর্বে) - যেখানে আমরা বিশুদ্ধ হাস্যরস ও বিষয়বস্তুর শালীনতা লক্ষ্য করি।

খ) মধ্যযুগীয় প্রহসন (খ্রি. ১০ম- ১৫শ শতক) - যেখানে বিষয়বস্তু ও ঔজ্জ্বল্যের মান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

গ) উত্তরযুগের প্রহসন (খ্রি. ১৫শ-১৯শ শতক) - যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্যতা ও অশালীনতা প্রাধান্য পেয়েছে।

ঘ) আধুনিক প্রহসন (১৯শ ও ২০শ শতক) - যেখানে সম্ভ্রান্ত সামাজিক প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের প্রহসনগুলি দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত।[৫]

আলোচ্য প্রহসনের বিভিন্ন পুঁথিতে কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের পিতা ও পিতামহের বিষয়ে এবং তিনি কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে নানা মত বর্তমান। Lassen পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে তাঁকে স্থাপন করেছেন। কীথ-এর মতে তিনি ধীরেশ্বরের বংশে জাত ধনেশ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র ছিলেন। তিনি বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা হরসিংহের রাজত্বকালে কাব্য লেখেন। হরপ্রসাদের মতে তিনি ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে *ধূর্তসমাগম* প্রহসন লেখেন। সুশীল কুমার দে তাঁকে ধীরেশ্বরের পুত্র বলে উল্লেখ করেন। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে যখন কর্ণাট বংশের রাজা হরসিংহ মিথিলা শাসন করছিলেন তখন জ্যোতিরীশ্বর *ধূর্তসমাগম* প্রহসন লেখেন। কৃষ্ণমাচারিয়ার জ্যোতিরীশ্বরকে ধীরেশ্বরের পুত্র বলে উল্লেখ করেন। তিনি পল্লীজন্ম নামক স্থানের ভূস্বামী এবং হরসিংহের মিত্র ছিলেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুঁথি অনুযায়ী ধীরেশ্বর তাঁর পিতামহ এবং ধরিত্রীশ্বর তাঁর পিতা ছিলেন। তিনি কর্ণাট বংশের রাজা হরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এই পুঁথিতে বলা আছে পল্লী তাঁর জন্মভূমি ছিল। তাঞ্জোর সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুঁথি অনুযায়ী জ্যোতিরীশ্বর ধনেশ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র ছিলেন। তিনি বিজয়নগরের রাজা নরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[৬]

ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে প্রাপ্ত পুঁথিতে জ্যোতিরীশ্বরকে ধীরেশ্বরের বংশের তিলক বলা হয়েছে। তিনি কর্ণাটচূড়ামণি হরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা ধীরেশ্বর ও পিতামহ ছিলেন রামেশ্বর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাট্যকার জ্যোতিরীশ্বরের জন্মস্থান, পিতা, পিতামহ, পৃষ্ঠপোষক রাজা ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত বর্তমান। তবে মোটামুটিভাবে তাঁকে চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে স্থাপন করা যেতে পারে। এতগুলি পুঁথিতে জ্যোতিরীশ্বরের সম্পর্কে এতরকমের মত থাকায় স্বীকার করে নিতে হবে যে জ্যোতিরীশ্বর এবং তাঁর *ধূর্তসমাগম* প্রহসন সেই সময় খুব জনপ্রিয় ছিল।

তিনি মৈথিল ও সংস্কৃত ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হল *বর্ণরত্নাকর*। এটি মৈথিল ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ। মধ্যযুগের ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান তথ্য এখানে পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় *পঞ্চসায়ক* নামে কামশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত *ধূর্তসমাগম* সংস্কৃত ভাষার একটি প্রহসন। বেশিরভাগ পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে *ধূর্তসমাগম* রচনা করেন। সুতরাং এটি মধ্যযুগীয় প্রহসন।

ধূর্তসমাগম প্রহসনের একটি পাণ্ডুলিপি ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (বোরি) থেকে পাই যার প্রতিলিপি ১৯৪০ সংবতে হয়েছিল। এতে সাতটি ফোলিও আছে। পাণ্ডুলিপির নং ৮০-এ১৮৮৩-৮৪। এই পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে অনেক দুর্বোধ্য শব্দ থাকায় এবং অনেক ত্রুটি থাকায় প্রহসনটির অন্য পাঠ খোঁজার চেষ্টা করি। অন্তর্জাল জগতে কয়েকটি পুঁথির বর্ণান্তরীকৃত ও মুদ্রিত রূপ পেয়ে যাই যাদের সংযোগসূত্রগুলি হল:

http://archive.org/details/Dhurtasamagama1958AnthologiaSanscritica/page/n5

http://archive.org/details/dhrtasamgama00jyotuoft/page/n1

ignca.nic.in/sanskrit/dhurta_samagama.pdf

এই তিনটি মূল পুঁথি নয়, মূল পুঁথির লিপ্যন্তরের দ্বারা প্রাপ্ত মুদ্রিত রূপ। একটি মূল পুঁথি ও তিনটি বর্ণান্তরীকৃত মুদ্রিতরূপ পাবার পর সব পাঠের মধ্যে যে পাঠটিকে যেখানে সঠিক বলে মনে হয়েছে সেটিকে গ্রহণ করে প্রহসনটিকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে তার অনুবাদ করে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তবে আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি কখনোই উদ্দিষ্ট প্রহসনের সমীক্ষাত্মক সংস্করণ নয়।

বোরি থেকে প্রাপ্ত পুঁথিটির পাঠের সঙ্গে ডাউনলোড দ্বারা প্রাপ্ত তিনটি বর্ণান্তরীকৃত মুদ্রিতরূপের পাঠের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন মূল পুঁথিতে বিচারকের নাম অসজ্জনমিশ্র কিন্তু পরে প্রাপ্ত তিনটি মূদ্রিত রূপেই বিচারকের নাম দেওয়া আছে অসজ্জাতিমিশ্র। আবার মূল পুঁথিতে জ্যোতিরীশ্বর কর্ণাট রাজবংশের রাজা হরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন বলা হলেও বাকী তিনটি পাঠে রাজা হরসিংহের জায়গায় নরসিংহের নাম আছে। এইরকম অনেক জায়গাতেই পাঠগুলির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নামের পাঠের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপতা লিপিকরের অনবধানতা প্রসূত হতে পারে। আর অন্যত্র যে সব পার্থক্য রয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে জনপ্রিয় প্রহসনের বিভিন্ন স্থানে অভিনয়ের প্রয়োজনে নাট্যরূপ দেবার সময় নাট্যপরিচালকের হাতে পাঠভেদ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ কোথাও কোথাও অনুরূপ প্রসঙ্গে একই চরিত্রের মুখে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংলাপ পাওয়া যাচ্ছে, যার তাৎপর্যের ক্ষেত্রে খুব একটা ভেদ নেই। পাঠগুলির মধ্যে যেটিকে সঠিক বলে মনে হয়েছে সেটিকে গ্রহণ করেছি ও অনুবাদের সময় সেটিকেই অনুসরণ করেছি।

আমি এই সন্দর্ভ রচনার সময় যে গবেষণারীতি অনুসরণ করেছি তা নিম্নে দেওয়া হল:

- আমি মডার্ন ল্যাংগুয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের বিহিত পদ্ধতিতে উল্লেখপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করেছি।
- আমি অভ্র বাংলা কীবোর্ডের কালপুরুষ ফন্টে ১.৫ লাইন স্পেসিং রেখে টাইপ করেছি।
- সংস্কৃত উদ্ধৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে বানানশৈলী অনুসৃত হয়েছে তা এরকম - য়, ড়, ঢ়, ৎ স্থানে য, ড, ঢ, ত্ লেখা হয়েছে। কারণ সংস্কৃতে পূর্বোক্ত বর্ণগুলির প্রথম তিনটির কোনো পৃথক উচ্চারণ হয় না, আর স্বরবর্জিত ত-কে অন্যান্য স্বরবর্জিত হস্‌চিহ্নিত বর্ণের মতই ত্ লেখা সমীচীন, আলাদা কোনো বর্ণ দিয়ে নয়।

প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী

১। ধনঞ্জয়, *দশরূপক,* চতুর্থ প্রকাশ, কারিকা (কা.)৭৫।

২। *তদেব,* কা.৭৬-৭৭।

৩। ভরত, *নাট্যশাস্ত্র,* ষষ্ঠ অধ্যায়, কা.৪০।

৪। *তদেব,* ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়, কা.৩৩।

৫। কে.কে.মালাঠি দেবী, *প্রহসনস্ ইন সংস্কৃত লিটারেচার অ্যান্ড কেরালা স্টেজ,* পৃ.৪২।

৬। *তদেব,* পৃ.৯৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পাদিত মূলপাঠ

धूर्तसमागमप्रहसनम्

श्री गणेशाय नमः ।

श्री कृष्णाय नमः ।

हर्षादम्भोजजन्मप्रभृतिदिविषदां संसदि प्रीतिमत्या
श्वश्रा मौलौ पुरारेर्दुहितृपरिणये साक्षतं चुम्ब्यमाने।
तद्वक्त्रं मौलिवक्त्रे मिलितमिति भृशं वीक्ष्य चन्द्रः सहासः
दृष्ट्वा तद्वक्त्रमाशु स्मितसुभगमुखः पातु वः पञ्चवक्त्रः॥१॥

अपि च

वक्त्राम्भोरुहि विस्मिताः स्तवकिता वक्षोरुहि स्फारिताः
श्रोणीसीमनि गुम्फिताश्चरणयोरक्ष्णोः पुनर्विस्तृताः।
पार्वत्याः प्रतिगात्रचित्रगतयस्तन्वन्तु भद्राणि वः
विद्यस्यान्तिकपुष्पसायकशरैरीशस्य दृग्भक्तयः॥२॥

नान्द्यन्ते सूत्रधारः

अलमतिविस्तरेण

यदद्य

नानायोधनिरुद्धनिर्जितसुरत्राणत्रसद्वाहिनी
नृत्यद्भीमकबन्धमेलकदलद्भूमिभ्रमद्भूधरः।

अस्ति श्रीनरसिंहदेवनृपतिः कर्णाटचूडामणि

दृप्यत्पार्थिवसार्थमौलिमुकुटन्यस्ताङ्घ्रिपङ्केरुहः॥३॥

तस्योद्युक्तभुजप्रतापदहनज्वालानिरस्तापदो

राज्ञः सर्वगुणानुवादपदवीविद्योतनाचार्यकः।

यो धीरेश्वरवंशमौलिमुकुटो दाता अवदाताशयः

तस्य श्रीकविशेखरस्य कविता मच्चित्तमालम्बते॥४॥

अनेन सकलसङ्गीतविशेषविद्योतनाभिनवभरतेन पुरमथनपदारविन्दद्वन्द्ववन्दारुकरपल्लवेन निखिलभाषोपभाषासुभं भावुकसरस्वतीकण्ठाभरणेन अनवरतसोमरसास्वादकषायकण्ठ-कन्दलीनरीनृत्यमान मीमांसामहोत्सवेन रामेश्वरस्य पौत्रेण तत्रभवतः पवित्रकीर्त्ते धीरेश्वरस्यात्मजेन महरशासनश्रोणिशिखरं श्रीमत्पल्लीजन्मभूमिना कविशेखराचार्येण श्रीज्योतिरीश्वरेण निजकुतूहलविरचितं धूर्तसमागमं नाम प्रहसनमभिनेतुमादिष्टोऽस्मि। तस्य चादिष्टमवश्यमिष्ट मालतीमालेव मया शिरसा धार्यम्।

तथा हि

कर्पूरन्ति सुधाद्रवन्ति कमलाहासन्ति हंसन्ति च

प्रालेयन्ति हिमालयन्ति करकासारन्ति हारन्ति च।

त्रैलोक्याङ्गनरङ्गलङ्गिमगतिप्रागल्भ्य संभाविताः

शीतांशोः किरणच्छटा इव जयत्येतर्हि तत्कीर्त्तयः॥५॥

अपि च

के नार्चिता दिविषदः कति न द्विजेशाः

सन्तर्पिता न कवयः कति पूजिता वा।

के वार्थिनः प्रतिदिनं न कृता कृतार्था

स्त्यागप्रसादपटुना कविशेखरेण॥६॥

तत् प्रेयसीमाहूय संगीतकमवतरामि।

नेपथ्याभिमुखमवलोक्य।

आर्ये! इतस्तावत्।

प्रविश्य पटाक्षेपेण

नटी : अज्ज एसम्हि। आणवेदु अज्जो। को णिओओ पसाईकरीअदुत्ति।

(आर्ये एषास्मि। आज्ञापयत्वार्यः। को नियोगः प्रसादीक्रियताम् इति।)

सूत्रधारः : आर्ये न जानासि?

यश्चत्वारि शतानि बन्धघटनालंकारभाञ्जि द्रुतं

श्लोकानां विदधाति कौतुकवशादेकाहमात्रे कविः।

ख्यातः क्ष्मातलमण्डलेष्वपि चतुः षष्टेः कलाया निधिः

संगीतागमसागरो विजयते श्रीज्योतिरीशः कृती॥७॥

तद्विरचितं धुर्तसमागमं नाम प्रहसनमभिनेतुमादिष्टोऽस्मि ।

तत् गीयतां नाट्योचितं किञ्चित्।

नटी : अज्ज कं सम अं उद्दिसिअ गाइस्सं।

(आर्यः कं समयम् उद्दिश्य गास्यामि।)

सूत्रधारः : ननु प्रोत्फुल्लमालतीमकरन्दसान्द्रामोदमत्तमधुकरकङ्कारमुखरो वसन्तः सन्ततोज्जृम्भितानङ्गशृङ्गार एव।

तथा हि

विकसितनवमल्लीकुञ्जगुञ्जद्विरेफः

कुसुमितसहकारश्रेणिनिर्यत्परागः।

प्रमुदितपिककण्ठप्रोच्छलन्मङ्गलश्री

अपहरति मुनेरप्येष चेतो वसन्तः॥८॥

नटी : मल आणिलचालिअचूअवणो

कलकण्ठिसराहिदकामिअणो।

म अरन्ददविमत्तशिलीमुहओ

सुरहीकिदसव्वदिसामुहओ॥९॥

(मलयानिलचालितचूतवनः

कलकण्ठिस्वराहृतकामिजनः।

मकरन्दविमत्तशिलीमुखकः

सुरभीकृतसर्वदिशामुखकः॥)

एसो वसन्तमासो मुणिअणसत्थस्स राअरहिदस्स।

उन्मूलिअ गुरुधीरं करेइ वम्महवसं हिअअं॥१०॥

(एष वसन्तमासो मुनिजनसार्थस्य रागरहितस्य।

उन्मूल्य गुरुर्धैर्यं करोति मन्मथवशं हृदयम्॥)

इति युगलं गायति।

नेपथ्ये

दण्डकमण्डलुमण्डितहस्तः

सुललिततिलकविभूषितमस्तः।

अयमुपसर्पति जङ्गमलोभः

चलकाशायपटार्पितशोभः॥११॥

नटी : अज्ज को एसो परिकखलन्तणिद्धोअकसाअवसणो दण्डकुण्डिआहत्थो धुत्तो विअ इदो तदो विलोएन्तो दीसदि।

(आर्य क एष परिस्खलन्निर्धौत कशायवसनो दण्डकुण्डिका हस्तो धूर्त इव इतस्ततो विलोकयन् दृश्यते।)

सूत्रधारः : आर्ये न जानासि?

यः श्रूयते जनमुखात् तुरगक्रियावान्

आचारधर्मरहितो गणिकाविलासी।

दीर्घोर्ध्व पुण्ड्रककमण्डलुदण्डलक्ष्यः

पुष्णाति विश्वनगरः किल दम्भमुग्रम्॥१२॥

तदेहि दर्शनमस्य दूरत एव परिहरणीयम्।

इति निष्क्रांतौ।

प्रस्तावना

ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः स्नातकेनानुगम्यमानो विश्वनगरः।

विश्वनगरः : सनिर्वेदः

हृदयकमलमध्ये निर्गुणो निष्प्रपञ्चः

त्रिभुवनपतिरेको ध्यायते योगिभिर्यः।

तमहमजरमाद्यं ज्ञानमात्रैकवेद्यं

मधुमथनमुदारं संततं चिन्तयामि॥१३॥

स्नातकः : समन्तादवलोक्य।

अहो रमणीअदा वसन्तस्स।

(अहो रमणीयता वसन्तस्य।)

जदो

(यतः)

उन्मीलन्तं पसूणं रइरसकुसला छप्पदा वम्महन्धा

कन्तारङ्गाणुरत्ता महुरसभविअं साणुराअं पिवन्ति।

उग्गाअन्ति स्फुरन्ता तिहुअणजइणो कामराअस्स कित्तिं

संवित्तिं हारअन्ता पिअअणविरहे कोइला कामिणीणं॥१४॥

(उन्मीलत् प्रसूनां रतिरसकुशलाः षट्पदा मन्मथान्धाः

कान्तारङ्गानुरक्ता मधुरसभवितं सानुरागं पिवन्ति।

उद्गायन्ति स्फुरन्तस्त्रिभुवनजयिनः कामरागस्य कीर्तिं

संवित्तिं हारयन्तः सह प्रियजनविरहे कोकिलाः कामिनीनाम्॥)

अबिअ

(अपि च)

जे कप्पूरं हरन्ता कमलवणसिरिं लोलअन्ता सहावं

साहाओ कम्पअन्ता निहुअणसुहआ चन्दणाणं वणाणं।

ते कन्दप्पस्स मित्ता रइतणुरमणीकेलिदप्पं कुणन्ता

तेल्लोअं मोहअन्ता मलअसिहरिणोसीअला वान्ति वाआ॥१५॥

(ये कर्पूरं हरन्तः कमलवनश्रियं लोडयन्तः सभावं

शाखाः कम्पयन्तो निधुवनसुखदाश्चन्द्रनानां वनानाम्।

ते कन्दर्पस्य मित्राणि रतितनुरमणीकेलिदर्पे क्वणन्तः

त्रैलोक्यं मोहयन्तो मलयशिखरिणः शीतला वान्ति वाताः॥)

ता कधं एसो अइदूसहो वसन्तसमओ मए एककसरीरेण सहिदव्वो।

(तत् कथं एष अतिदुःसहो वसन्तसमयो मया एकशरीरेण सोढव्यः।)

इति वैमनस्यं नाटयति।

विश्वनगरः : स्नातकं निर्वर्ण्य।

वत्स दुराचार कथमद्य चिन्ताभारनतकन्धरोऽन्यादृश इव विलोक्यसे।

तथा हि

निःश्वासे पीवरत्वं वपुषि सुतनुता श्रून्यता दृष्टिपाते

वक्त्रेन्द्रौ धूसरत्वं गतिषु विधुरता चेतसि म्लानता च।

चेष्टा नैवेक्ष्यते ते यदधिकविकलं रूपमासादितस्त्वं

तन्मन्ये पञ्चवाणस्तिरयति भवतो धीरतां पूर्वरूपाम्॥१६॥

स्नातकः : सलज्जमधोमुखः स्थित्वा

भअवं अदिलज्जाकरं कखु एदं। ता ण जुत्तं तुम्ह पुरदो पआसिदुं।

(भगवन्नतिलज्जाकरं खलु एतत्। तन्न युक्तं युष्माकं पुरतः प्रकाशयितुम्।)

विश्वनगरः : न दोषः स्वरूपाख्याने। तत् कथ्यताम्।

स्नातकः : सप्रणामम्।

भअवं अज्ज मए महापहादे णअरपोकखरिणीपरिसरे उबहसिदसुरणाअरीरूबसंपत्ती अणङ्गसेणाणाम् वारविलासिणी विलोइदा। तदो पहुदि सव्वगदं तं ज्जेव पेकखामि।

(भगवन्नद्य मया महाप्रभाते नगरपुष्करिणीपरिसरे उपहसितसुरनागरीरूपसंपत्तिरनङ्गसेना नाम वारविलासिनी विलोकिता। ततः प्रभृति सर्वगतां तामेव प्रेक्षे।)

विश्वनगरः : सहस्ततालमुच्चैर्विहस्य।

वत्स अद्य मयापि तत्रैव सुरतप्रिया नाम मासोपवासिनी दृष्टा। तामनुसन्दधानोऽहमपि मर्मभेदिना कामवाणेन सन्दलित इवास्मि।

तथा हि

आकाशे लिखितेव दिक्षु खचितेवाकीर्णरूपेव च

दृक्यक्ष्मप्रतिबिम्बितेव मनसि श्लिष्टेव बद्धेव च।

सा मच्चित्तसरोरुहे मधुकरीवात्यन्तभावोत्तरा

कान्ता कान्तविलासवासवसतिः कास्तीति न ज्ञायते॥१७॥

ऊर्ध्वमवलोक्य।

वत्स। मध्याह्नमारूढो भगवानं सहस्रांश्रु।

तथा हि।

दिक्चक्रं मृगतृष्णया कवलितं व्योमापि भास्वत्कर

छायाभिश्छुरितं तुषानलकणप्रायाश्च भूरेणवः।

पान्थाः पल्वलसंकुलद्रुमलताकुञ्जोदरे शेरते

मज्जत्कुञ्जरपानलोहितजलाः क्षुभ्यन्ति तोयाशयाः॥१८॥

तद्भिक्षाकरणार्थमत्रैव कमपि गृहमेधिनमनुसराव।

इति निष्क्रामतोस्तयोर्मध्ये।

स्नातकः : अग्रतोऽवलोक्य।

भो भो भअवं पेक्ख।

(भो भगवन् प्रेक्षस्व।)

विहिदभअवन्तजणमुण्डसरिच्छबहुअरमहिसीखम्भसोहन्तच उस्सालं इदोतदोसंचरन्तबालगोवच्छसोहिदं

पीणुत्तुङ्गत्थणालसपरिक्खलन्तमन्दसंचाररमणिज्जावासपरिसरसंचरन्तचेलिआसमुहं

कस्स बि महाधणस्स वासभअणं विलोईअदि।

(विहितभगवज्जनमुण्डसदृशबहुतरमहिषीस्तम्भशोभमान चतुःशालम् इतस्ततः सञ्चरद्बालगोवत्सशोभितं पीनोत्तुङ्गस्थनालसपरिक्षलन्मन्दसञ्चाररमणीयवासपरिसर सञ्चरच्चेटिकासमुहं कस्यापि महाधनस्य वासभवनं विलोक्यते।)

नेपथ्ये

लक्ष्मीविवर्तरसविघ्नितसर्वभोगः

शश्वत्प्रकीर्णधनचिन्तितवीतनिद्रः।

अग्राह्यनामकतया भुवि यः प्रसिद्ध

स्तस्यैतदाश्रमपदं पुरतो विभाति॥१९॥

स्नातकः : पुनरग्रतो गत्वा।

भो णाअरा कस्स इदं वासभअणं इति पृच्छति।

(भो नागराः कस्येदं वासभवनम् इति पृच्छति।)

पुनर्नेपथ्ये

विश्वनगरः : आः क एष नामग्रहणे निर्बन्धः भवतः। अथवा यद्वा तद्वास्तु श्रूयताम्। मृताङ्गारठक्कुरस्याश्रमोऽयम्। वत्स अलं विलम्बेन। आवासाभ्यन्तरमेव प्रविशाव। इत्यावासप्रवेशं नाटयित्वा कुत्राप्येकान्ते स्थितौ।

ततः प्रविशति कश्मलवेशो मृताङ्गारः।

व्यापशीलः कुबेरोऽपि कामं याति दरिद्रताम्।

अपि प्राणाः प्रदातव्या नार्थिभ्यो धनिकैर्धनम्॥२०॥

स्नातकः : उपसृत्य।

भो महाबम्भण! भअवन्तो विस्सणअर चरणा तुम्हाणं गेहे भिक्खं भुञ्जिदुं इछन्ति।

(भो महाब्राह्मणं भगवन्तो विश्वनगरचरणा युष्माकं गेहे भिक्षां भोक्तुमिच्छन्ति।)

मृतांगारः : स्वगतम्।

अहोदुर्दैवमस्माकं यदेतान् सकलनगरीयाद्यलोकान् विहाय मयि एव पतितो धूमकेतुः।

तत् कः प्रतीकारोऽद्य भविष्यति।

इति विचिन्त्य तावत् प्रकाशं सविनयम्।

स्थाने यस्य चरन्ति भैक्ष्यमनघाः स्नेहेन युष्मादृशः

स स्यादच्युतमूर्तिसेवनवशाद्यन्यः पवित्रालयः।

किंत्वस्मत्प्रतिवेशिविप्रवनिता भ्रातृप्रसक्ताङ्गना

दूती सप्रसवेति सूतकमतः स्थानान्तरं गम्यताम्॥२१॥

विश्वनगरः : स्वगतम्।

अहो दुरात्मनोऽस्य व्याजव्यवहारः। भवतु वा। तत् प्रबोधयामि।

प्रकाशम्।

आयुष्मन् यतीनामस्माकं कुतः सूतकदोषः।

न वायुः स्पर्शदोषेण नाग्निर्दहनकर्मणा।

नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी॥२२॥

मृतांगारः : सविनयम्।

भगवन् यद्यप्येवं तथापि न सम्भवति। पश्य।

अनावृष्ट्या कृषिर्नष्टा राष्ट्रभङ्गादृणादिकम्।

बाणिज्यमल्पलाभेन प्रातराशस्य का कथा॥२३॥

स्नातकः : सक्रोधं संस्कृतमाश्रित्य।

अहो धिङ् मौर्ख्यं जलधिसुतायाः श्रियः।

नो जानाति कुलीनमुत्तमगुणं सत्त्वान्वितं धार्मिकं

नाचारप्रवणं न कार्यकुशलं न प्रज्ञयालंकृतम्।

नीचं क्रूरमपेतसत्त्वहृदयं यस्मादियं सेवते

तत् त्वं सानुगुणः पयोधिसुतया लक्ष्म्या प्रमाणीकृतः॥२४॥

अरे नट्ठपरलोआ। दुट्ठबम्हणा ईदिसे दूसहमज्झण्हे पठमं तुमं महाधणं भेक्खिअ कुदो अणदो गदुअ अम्हेहिं भिक्खा पत्थिदव्वा।

(अरे नष्टपरलोक दुष्टब्राह्मण ईदृशे दुःसहमध्याह्ने प्रथमं त्वां महाधनं भिक्षित्वा कुतोऽन्यतो गत्वा अस्माभिर्भिक्षा प्रार्थयितव्या।)

मृतांगारः : भगवन्नस्मदावासोत्तरे सुरतप्रिया नाम मासोपवासिनी प्रतिवसति। तत्र गम्यताम्।

इत्यभिधाय सत्वरं परिक्रान्तः।

विश्वनगरः : यद्येवं ततः समीहितमेव नः संपन्नम्। तदेहि तत्रैव गच्छाव।

इति निष्क्रांतौ।

स्नातकः : पुरोऽवलोक्य गन्धमाघ्राय च।

भअवं पेक्ख। पेक्ख। एकाङ्गिआमुत्थमेत्थिआसंजुत्तमहाहन्दकुट्ठ परिमलुग्गारोअग्गिमभवणदो णं सेवदि। ता एदं ज्जेव सुरतप्पिआए वासभवणम् इति तक्केमि।

(भगवन् प्रेक्षस्व। प्रेक्षस्व। एकाङ्गिकामुस्तमात्रिकासंयुक्तमहाकन्दकुष्ठपरिमलोद्गारोऽग्रि मभवनादेनां सेवते। तदेतदेव सुरतप्रियाया वासभवनम् इति तर्केमि।)

विश्वनगरः : विदग्धैव किल मासोपवासिनीति किंवदन्ती। तदागच्छोपसर्पाव।

इत्येकान्ते स्थितौ।

ततः प्रविशति सुरतप्रिया।

धम्मो ण इट्ठो बहुदुक्खचेट्ठो

मोक्खेण सोक्खं मम अत्थि सच्चं।

अत्थो समत्थो सअलं विधादुं

अनङ्गसव्वस्सकलाणिहाणम्॥२५॥

(धर्मो न इष्टो बहुदुःखचेष्टो

मोक्षेण सौख्यं ममास्ति सत्यम्।

अर्थः समर्थः सकलं विधातुं

अनङ्गसर्वस्वकलनिधानम्)

स्नातकः : उपसृत्य।

अज्जे विस्सणअरो तुम्हाणं अदिधी उअत्थिदो।

(आर्ये विश्वनगरो युष्माकमतिथिरूपस्थितः।)

सुरतप्रिया : परिक्रम्यावलोक्य च।

कधं। भअवं। ता उपसप्पामि।

(कथं। भगवन्। तदुपसर्पामि।)

उपसृत्य।

भअवं पणमामि।

(भगवन् प्रणमामि।)

विश्वनगरः : सप्रमोदम्।

मदभिलसितभाजनं भूयाः।

सुरतप्रिया : भअवं तुम्हाणं पसादेण।

(भगवन् युष्माकं प्रसादेन।)

विश्वनगरः : एवमचिरादस्तु।

सुरतप्रिया : आणबेदु भअवं जं मए कादव्वं दाअव्वं च।

(आज्ञापयतु भगवान् यद् मया कर्तव्यं दातव्यं च।)

विश्वनगरः : शुभे। किमदेयमस्माकं भवत्या। सांप्रतं भिक्षैव तावत्।

सुरतप्रिया : भअवं कीदिसी भिक्खा कीदिसीए वेलाए केत्तिआइं ते अणाइं।

(भगवन् कीदृशीं भिक्षा कीदृश्यां वेलायां कियन्ति ते अन्नानि।)

विश्वनगरः : सहर्षः।

श्रूयताम्।

मांसं माषपटोलतक्रवडिकावास्तूकशाकं वटः

संजीवन्यथ मत्स्यमुद्गविदलप्रायः प्रकारोत्करः।

अन्नं स्वादु पयो घृतं दधि नवं रम्भाफलं शर्करा

संक्षेपादिति साध्यतां सुवदने भिक्षा मदीया द्रुतम्॥२६॥

सुरतप्रिया : विहस्य।

स्वगतम्।

हूं एसो महप्पा अप्पविसज्जणजोग्गो ज्जेव देववरस्स पसाएण संपणो।

(हूं एष महात्मा आत्मविसर्जनयोग्य एव देववरस्य प्रसादेन संपन्नः।)

प्रकाशम्।

अञ्जलिं बध्वा

एदं सरीरं विरहेण जुत्तं

पाणा तहा धम्मफलेक्कसा।

सव्वं तुहाअत्तं उदारकित्ति

का वाहिरे वत्थुणि अत्थि अत्था॥२७॥

(इदं शरीरं विरहेण युक्तं

प्राणास्तथा धर्मफलैकसाराः।

सर्वे त्वदायत्तमुदारकीर्ते

का वाह्यवस्तुनि अस्ति आस्था॥)

ता अन्तरघरं पविसिअ वीसमीअदु भअवं। अहं उण भिक्खापआरं करोमि।

(तस्मादन्तरगृहं प्रविश्य विश्राम्यतां भगवान्। अहं पुनर्भिक्षाप्रकारं करोमि।)

स्नातकः : भअवं पेक्ख।

(भगवन् प्रेक्षस्व।)

संस्कृतमाश्रित्य।

पक्वाः कुन्तलराजयः कटकटाक्षामौ कपोलावुभाव्

एतस्याः स्तनमण्डलं निपतितं श्रुष्का नितम्बस्थली।

दृक्पातस्मितभाषितैः शिव शिव प्रस्तौति नेत्रोत्सवं

किं ब्रूमः करवाम वेति किमियं दुष्टा जरत्तापसी॥२८॥

विश्वनगरः : धिङ् मूर्ख किमसाधुजनोचितं प्रलपसि।

सुरतप्रियां प्रति।

शुभे गम्यतां पाकशालां प्रति। वयमप्यागच्छन्त एवास्महे।

सुरतप्रिया : जं भअवं आणबेदि।

(यद्भगवानाज्ञापयति।)

इति निष्क्रान्ता।

स्नातकः : भअवं जाव भिक्खा सिज्झदि ताव एत्थ ज्जेव भअवं टिट्ठदु। अहं उण अणङ्गसेणिआए पउत्तिं जाणिअ लहुं आअछामि।

(भगवान् यावद्भिक्षा सिध्यति तावदत्रैव भगवान् तिष्ठतु। अहं पुनरनङ्गसेनिकायाः प्रवृत्तिं ज्ञात्वा लघु आगच्छामि।)

विश्वनगरः : वत्स सहैव गम्यताम्।

इति परिक्रामतः।

स्नातकः : भअवं मूलणासअणाबिदस्स गेहसंणिहाने अणङ्गसेनाए वासभवणं त्ति मए सुदं। ता तस्स ज्जेव अणुसारेण अणेसम्ह।

(भगवन् मूलनाशकनापितस्य गेहसंनिधाने अनङ्गसेनाया वासभवनम् इति मया श्रुतम्। तस्मात् तस्यैवानुसारेणान्वेषामहै।)

अग्रतोऽवलोक्य ।

भो भअवं। पेक्ख।

एसा अणङ्गसेणा सुरविलासिणी विअ विलोईअदि।

(भगवन्। प्रेक्षस्व। एषा अनङ्गसेना सुरविलासिनी इव विलोक्यते।)

विश्वनगरः : तदा गच्छाग्रतः। एनामुपसर्पाव।

इत्येकान्ते स्थितौ।

ततः प्रविशति अनङ्गसेना।

स्नातकः : सहसोपसृत्य।

भअवं पेक्ख।

(भगवन् प्रेक्षस्व।)

अणङ्गसेनाए लावणलछिं।

(अनङ्गसेनाया: लावण्यलक्ष्मीम्।)

णीलम्भोरुहपत्तकन्तणअणा संपुणचन्द्राणणा

उत्तुङ्गत्थणभारभङ्गुरतणू वेइव्व मज्झे किङ्।

बाला मत्तगइन्दमन्दगमणा सुन्देरसोहामई

णूणं पञ्चसरस्स मोहणलआ सिङ्गारसंजीवणी॥२९॥

(नीलाम्भोरूहपत्रकान्तनयना संपूर्णचन्द्रानना

उत्तुङ्गस्तनभारभङ्गुरतनुर्वेदिरिव मध्ये कृशा।

बाला मत्तगजेन्द्रमन्दगमना सौन्दर्यशोभामयी

नूनं पञ्चशरस्य मोहनलता शृङ्गारसंजीवनी॥)

विश्वनगरः : स्वगतम्।

यन्नेत्राञ्जनभङ्गिलङ्गिममयस्मेराननाम्भोरुहा

यत् साकूतकलाविलासवसतिर्यत् कान्तरोमोद्गमा।

मद्गावेङ्गितसंगतिं तनुलतामालोक्य गोपायति

प्रायस्तत् कथयत्यनङ्गरचनामङ्के कृशाङ्गी स्थिताम्॥३०॥

प्रकाशम्।

वत्स। सम्यगुपलक्षितम्।

तथा हि

यत्तीर्थाम्बु मुखाम्बुजासवरसो नेत्रे नवेन्दीवरे

दन्तश्रेणिनखास्ताक्षतचयो दूर्वा च रोमावली।

उत्तुङ्गं च कुचद्वयं फलयुगं पत्रं कराम्भोरुहं

तन्मन्ये मदनार्चनाहितमतिः स्वाङ्गोपहारैरियम्॥३१॥

अनङ्गसेनां लक्ष्मीकृत्य।

यत्पूर्वं रचितं तपः प्रतिदिनं या तीर्थयात्रा कृता

यद्धूम्ना पुरुषोत्तमार्चनविधौ चेतः कृतार्थीकृतम्।

तस्यैतत् परमप्रमोदजनकं प्राप्तं फलं कर्मणः

तत् किं शास्त्रकथारसेन किमहो स्वर्गेण मोक्षेण वा॥३२॥

इति कामावस्थां नाटयति ।

स्नातकः : सहर्ष वैराग्यम्।

स्वगतम्।

एसो लम्पडो उन्दुरुविअरे सप्पो विअ पइट्ठो। भोदु। जुत्तिपहाणेहिं वअणेहिं णिवारइस्सं।

(एष लम्पट उन्दुरुविवरे सर्प इव प्रविष्टः। भवतु। युक्तिप्रधानैर्वचनै वारयिष्यामि।)

प्रकाशम्।

भअवं। तुमं उपेक्खिदसंसारसोक्खो मोक्खेकपराअणो कधं एआरिसे मअतिणहासरिसे मअणरसे पलिअ अप्पाअणं वाबादेसि। णिअत्तीअदु इमादो दुट्ठगणिआपसंगादो त्ति।

(भगवन्। त्वमुपेक्षितसंसारसौख्यो मोक्षैकपरायणः कथं एतादृशे मृगतृष्णासदृशे मदनरसे पतित्वा आत्मानं व्यापादयसि। निवर्त्यतां अस्माद् दुष्टगणिकाप्रसङ्गादिति।)

विश्वनगरः : स्वागतम्।

वत्स। नैवं पश्यसि।

यावद्दृष्टिर्मृगाक्षीणां न नरीनर्ति भङ्गुरा।

तावज्ज्ञानवतां चित्ते विवेकः कुरुते पदम्॥३३॥

अनङ्गसेना : विहस्य।

भअवं। धणाधीणो कखु अअं जणो। एत्थ अरणरुदिअं कटुअ अप्पाणअं विडम्बेसि।

(भगवन्। धनाधीनः खलु अयं जनः। अत्र अरण्यरूदितं कृत्वात्मानं विडम्बयसि।)

विश्वनगरः : प्रिये।

सन्यासिनामस्माकं कुतो धनसंपत्तिः। तदस्मच्छरीरेण यथासुखं विनियोगः क्रियताम्।

सानुरागम्।

बाले मृनालदलकोमलवाहुदण्डे

चण्डि प्रचण्डवदने मयि देहि दृष्टिम्।

एष त्वदीयवदनाम्बुजकृष्टचेता

दीनो यतिः सपदि मज्जति कामसिन्धौ॥३४॥

इति कामावस्थां नाटयति।

स्नातकः : भो भअवं तुमं उपेक्खिदसंसारसोक्खो।

(भो भगवन् त्वम् उपेक्षितसंसारसौख्यो।)

इत्यादि पुनः पठति।

अनङ्गसेना : संस्कृतमाश्रित्य।

भगवन्नलमत्रात्यन्तानुसंधानेन।

वागर्थं परिगृह्य मोक्षपदवीं ध्यायन्ति निर्मत्सराः

शान्तप्रौढकुलीनहीनविषये सर्वत्र साधारणाः।

रागद्वेषममत्वकर्षितधियो वेश्याः सुरा भिक्षवो

वस्तुं नन्वपि नित्यमित्यहह किं कामार्णवे मज्जसि॥३५॥

विश्वनगरः : प्रिये गृहाणास्मच्छरीरम्।

इत्यञ्चले दधाति।

स्नातकः : सहसोपश्रित्य।

अरे णट्ठपरलोआ दुट्ठहपरिव्वाअआ एसा पठमं अम्हपरिग्गहेणः तुह पुत्तबहू होदि। ता मुञ्च एणं।

(अरे नष्टपरलोक दुष्टपरिव्राजक एषा प्रथममस्मत्परिग्रहेण तव पुत्रबधूर्भवति। तस्माद् मुञ्चैनाम्।)

विश्वनगरः : धिङ् मूर्ख। एषास्मद्बधूस्त्वदुरुपत्नी मातृतुल्या च। तत् किमेनामनुबध्नासि।

स्नातकः : सक्रोधम्।

अरे रे लम्पडा एवं भणन्तस्स दण्डप्पहारेण पक्कमालूरफलं विअ मुण्डं दे थत्थरं करइस्सं।

(अरे रे लम्पट एवं भणतो दण्डप्रहारेण पक्वमालूरफलमिव मुण्डं तव खण्डशः करिष्यामि।)

इत्यन्योन्यं कलहं कुरुतः।

अनङ्गसेना : स्वगतम्।

कथं धूत्तहत्थपलिदम्हि। भोदु एवं ताव।

(कथं धूर्तहस्तपतितास्मि। भवतु एवं तावत्।)

प्रकाशम्।

भो महाभाअधेआ तुम्हाणं एआरिसे महाविवादे असज्जाइमिस्सो पमाणीकरीअदु।

(भो महाभागधेयौ युष्माकमेतादृशे महाविवादे असज्जनमिश्रः प्रमाणीक्रियताम्।)

विश्वनगरः : प्रिये भवतु तावदेवम्।

स्नातकः : पिये दसटङ्कआ मए दादव्वा। ता तं गेणिहअ मह मणोहरं संपादेहि।

(प्रिये दशटङ्का मया दातव्याः। तस्मात् तद् गृहीत्वा मम मनोहरं संपादय।)

इति ग्रन्थिं दर्शयति।

विश्वनगरः : अलं ग्रन्थिदर्शनेन। आगच्छत। तत्रैव गच्छावः।

इति निष्क्रान्ताः सर्वे।

इति प्रथमः सन्धिः।

ततः प्रविशति असज्जनमिश्रो विदूषकश्च।

असज्जनमिश्रः : सप्रमोदम्।

त्रैलोक्यभोजनं श्रेष्ठं ततोऽपि सुरतोत्सवः।

भोजनं वास्तु वा नास्तु जीवनं सुरतं विना॥३६॥

वत्स वन्धुवञ्चक आगच्छाधीष्व।

विदूषकः : जं मिस्सो आणवेदि ।

(यद् मिश्र आज्ञापयति।)

असज्जनमिश्रः : यद्रामावक्त्रपानं यदलसनयनालोकनं केलिरङ्गे

यः स्यादप्यङ्गसंगः कुचकलससमुत्पीडने वाहुभङ्गिः।

एतत् संसारसारं कुरु निजहृदये निर्विकल्पैककल्पं

किं ते कार्यं विवादक्वथितऋजुमतिग्रन्थकन्थाभरेण॥३७॥

विदूषकः : भो मिस्स। पराङ्गनासंभोगादो पि परमन्दिरे संधिं कदुअ जं अत्थो अबहरीअदि तं ज्जेव तिहुअणसारं।

(भो मिश्र पराङ्गनासंभोगादपि परमन्दिरे संधिं कृत्वा यदर्थोऽपह्रियते तदेव त्रिभुवनसारम्।)

पेक्ख।

(प्रेक्षस्व।)

किं बाणिज्जेण कज्जं णिअधणविलअं तं कखु काऊण दुकखं

किंवा कज्जं किसीए पसुवसुणिअमाआसणिक्कज्जदाए।

किं विज्जाए फलं वा मरणसमसमुप्पणचिन्ताउलाए

एक्कं तेल्लोअसारं परधणहरणं जूअकीलासुहं च॥३८॥

(किं बानिज्येन कार्ये निजधनविलयं तं खलु कृत्वा दुःखं

किं वा कार्ये कृप्या पशुवसुनियमायासनिष्कार्यतया।

किं विद्यायाः फलं वा मरणश्रमसमुत्पन्नचिन्ताकुलायाः

एकं त्रैलोक्यसारं परधनहरणं द्यूतक्रीडासुखं च।)

ता एत्थ धूत्तउरणअरे जादिसो तुमं गुरू तादिसो अहं सिस्सो संवुत्तो।

(तदत्र धूर्तपुरनगरे यादृशस्त्वं गुरुस्तादृशोऽहं शिष्यः संवृत्तः।)

असज्जनमिश्रः : सवैराग्यम्। अहो अस्मिन् नगरे निरुपधिजीवनतास्मद्विधश्रोत्रियाणाम्। यतो दिनाष्टतयादारभ्य न कश्चिद्विप्र कश्चिन्न्यायवादी न कपटश्राव्यप्रतिलम्भो न च गणिकाजनालापः।

नेपथ्ये।

भो विज्ञाप्यतामसज्जनमिश्रस्य न्यायकरणार्थं वादिनौ द्वारि वर्तेते।

असज्जनमिश्रः : उच्चैः वत्स बन्धुवञ्चक शीघ्रं प्रवेशयतौ।

विदूषकः निष्क्रम्य विश्वनगरस्नातकानङ्गसेनाभिः सह पुनः प्रविशति।

असज्जनमिश्रः : विश्वनगरस्नातकौ अवलोक्य।

स्वगतम्।

कथमनर्थान्तरमापतितम्।

प्रकाशम्।

भगवन्। आगन्तुका वयम्। तन्नात्र भिक्षावसरः।

विदूषकः : भो मिस्स एदे ज्जेव वादिणा। एदाणं विवादं विचारेदु मिस्सो।

(भो मिश्र एतावेव वादिनौ। एतयोर्विवादं विचारयतु मिश्रः।)

असज्जनमिश्रः : सहर्षं सगौरवं च।

आसनमुपनीयतां भगवते विश्वनगराय स्नातकाय च।

बिदूषकस्तथा कृत्वा सर्वानुपवेशयति।

असज्जनमिश्रः : कोऽर्थी। कः प्रत्यर्थी।

स्नातकः : भासाए अहं अत्थी णिअरकरणे भअवं ।

(भाषायमहमर्थी निकरकरणे भगवान्।)

असज्जनमिश्रः : न्यायवादिनः प्रथमतो निकरः पश्चाद्भाषोत्तरे।

विश्वनगरः : अयमस्मत्सन्यासदण्डो निकरः ।

स्नातकः : एदं मे इन्दासणकोल्लिअं णिअरकरणेपविणीअदु।

(इदं मे इन्दाशनकौलिकं निकरकरणे प्रविनीयताम्।)

असज्जनमिश्रः : सगौरवं गृहीत्वा सप्रमोदम् आघ्राय किंचिद्विनियुज्यते।

निद्राकरं दोषविनाशहेतु

क्षुधाकरं बुद्धिविकाशकं च।

इन्द्राशनं कामबलानुकूलं

लब्धं मया दैववशादिदानीम्॥३९॥

विश्वनगरः : स्वाधीनयौवना सुभ्रूः सा मान्या सर्वकामिनाम्।

अस्माभिरियमाक्रान्ता मदीया तेन वल्लभा॥४०॥

असज्जनमिश्रः : भाषां भूमौ लिखित्वा स्नातकं प्रति।

स्नातक सत्वरमुत्तरं कुरु।

स्नातकः : एसा पुव्वं मए दिट्ठा दाऊण दसटङ्कआ।

आणीदा अ मदिं दाइं मदीआ तेन वल्लहा॥४१॥

(एषा पुर्वे मया दृष्टा दत्वा दशटङ्कान्।

आनीता च मतिं दयितां मदीया तेन वल्लभा।)

असज्जनमिश्रः : उत्तरमभिलिख।

विदूषकः : भो मिस्स। पेक्ख। पेक्ख। अनङ्गसेणाए लावणलछिं।

(भो मिश्र प्रेक्षस्व प्रेक्षस्वानङ्गसेनाया लावण्यलक्ष्मीम्।)

मअलञ्छणबिम्बफुरन्तमुही

णअणुप्पलचञ्चलकेलिणिही।

थणभारणआ अइमज्झकिसा

पठमोदिअचन्दकलासरिसा॥४२॥

(मृगलाञ्छनबिम्बस्फुरन्मुखी

नयनोत्पलचञ्चलकेलिनिधिः।

स्तनभारनतातिमध्यकृशा

प्रथमोदितचन्द्रकलासदृशा।)

असज्जनमिश्रः : अनङ्गसेनामालोक्य।

अहो निर्माणवैदग्धी विधातुः।

तथा हि।

नीलोल्लसल्ललितखञ्जनमञ्जुनेत्रा

संपूर्णशारदकलानिधिकान्तवक्त्रा।

बाला जगत्रयमनोहरदिव्यमूर्ति

र्मन्ये विभाति जगति स्मरवीरकीर्तिः॥४३॥

भो वादिनौ। एषा विवादाध्यासितानङ्गसेना जयपराजयं यावत् मध्यस्थस्थाने स्थाप्यताम्। एवंविधे च माध्यस्थ्ये वयमेव नृपतिव्यवस्थिता मध्यस्थाः।

अनङ्गसेनामानीय स्वसंनिधावुपवेश्य तदीयं हस्तं स्वहृदये निधाय।

सप्रमोदम्।

विकचकमलकोषश्रीरियं काम्यभूतिः

हिमकरकरजाताचन्द्रकान्तादि शीतः।

मृगमदघनसारासंगसौरभ्यभव्यो

हरति मदनतापं कोमलः पाणिरस्याः॥४४॥

क्षणं विचार्य उच्चैर्विहस्य।

भो वादिनौ। एतद्राज्यक्षेत्रेभुजङ्गयोरिवयुवयोर्विवादः।

तथा हि।

नैषा त्वदीया भवतोऽपि नेयं

मत्संनिधिष्ठा सुभगा मदीया।

स्वप्नेऽपि पूर्वं मयि जातकेलिः

ततोऽपि हेतोः खलु वल्लभा मे॥४५॥

विदूषकः : अनङ्गसेनामालोक्य।

जनान्तिकम्।

भो सुन्दरि। एसो मिस्सो वुड्ढो भअवं णिद्धणो सिणादओ इच्छारअणो। ता एदाणं समागमं परिहरिअ अम्हसमागमेण तुह जोव्वणं सफलं भोदु।

(भो सुन्दरि। एष मिश्रो वृद्धो भगवान् निर्धनः स्नातकः इच्छारचनः। तस्मादेतेषां समागमं परिगृह्य अस्मत्समागमेन तव यौवनं सफलं भवतु।)

इत्यात्मानं दर्शयति।

अनङ्गसेना : सस्मितम्।

एदं धूर्तसमागमपहसणं संवुत्तं।

(एतत् धूर्तसमागमप्रहसनं संवृत्तम्।)

विश्वनगरः : सवैराग्यम्।

वत्स दुराचार न हि जलौकसामङ्गे जलौका लगति। मूलनाशकस्यायं विचारः। तदेहि सुरतप्रियाया एव भवनं गच्छाव।

इति निष्क्रान्तौ।

ततः प्रविशति पटाक्षेपेण मूलनाशकः।

अले अले अनङ्गसेनिए जाणिदे तुम्ह चलिदं जं वालं वालं कअमअमन्दिलकखौलवेदणं पत्थन्ते बहुवालं हग्गे तए पआशिदे। ता शंपदं पअछ। अणधा लाअदोहाइं दाव दाइश्शं।

(अरे अरे अनङ्गसेनिके ज्ञातं तव चरितं यद् वारं वारं कृतमदनमन्दिरक्षौरवेतनं प्रार्थयन् बहुवारमहं त्वया प्रकाशितः। तस्मात् सांप्रतं प्रयच्छ। अन्यथा राजद्विधानि तव दास्यामि।)

अनङ्गसेना : मूलनासअ संपदं ज्जेव असज्जनामिस्सादो तुह दाइस्सं। ता सुत्थो होहि।

(मूलनाशक सांप्रतमेव असज्जनमिश्रात् तव दास्यामि। तस्मात् सुस्थो भव।)

विदूषकः : को एसो दुट्ठदंसणो दुट्टचरिदो दुट्ठवअणो।

(क एष दुष्टदर्शनो दुष्टचरितो दुष्टवचनः।)

असज्जनमिश्रः : एष किं भगवदगोचरः।

पश्य।

छिन्नौष्ठनासो गलगण्डनम्रो

वामाक्षिकाणो गलितैकपाणिः।

शिलीपदव्यापृतदक्षिणाङ्घ्रिः

स मूलनाशः किल नापितोऽसौ॥४६॥

मूलनाशकः सहसोपसृत्य सर्वेषां सप्रमाणामादर्शे दर्शयति।

असज्जनमिश्रः : मूलनाशक क्रियतामस्माकं नखलोम्नां परिष्कारः।

मूलनाशकः : पठमं वेदनं पअछ।

(प्रथमं वेतनं प्रयच्छ।)

असज्जनमिश्रः : मूलनाशक। किमर्थम्।

मूलनाशकः : भो जदि तुमं परिकखलन्ते पठमं ज्जेव मलिश्शशि ता वेदनं किण पइछिदव्वं।

(भो यदि त्वं परिस्खलन् प्रथमं मरिष्यसि तदा वेतनं केन प्रयन्तव्यम्।

असज्जनमिश्रः : अलं परिहासेन। गृह्यतामिदं पारितोषिकमिति कौलिकादाकृष्य गज्जाङ्घ्रिणीं ददाति।

मूलनाशकः सगौरवं गृहीत्वा सप्रमोदम् आघ्राय किञ्चिद्विनियुज्य च मिश्रस्य करचरणयोर्बन्धनं कृत्वा व्यापारं नाटयति।

अस्ज्जनमिश्रः : सवेदनम्।

दलति हृदयमेतन्मोहमभ्येति चेतः

स्फुटति सकलदेहे कीकसग्रन्थिसन्धिः।

विरम विरम शिल्पान्मूलनाश त्वमस्मात्

शिव शिव मम सद्यो जीवनं कुव्यतीव॥४७॥

इति मोहमुपगच्छति ।

मूलनाशकः : चालयित्वा।

कधं मलिदे असज्जणमिस्सेलहू लहू अबकमिश्शं।

(कथं मृतोऽसज्जनमिश्रः। लघु लघु अपक्रमिष्यामि।)

इति निष्क्रान्तः।

विदूषकः : मिश्रस्य करचरणयोर्बन्धनमपनीय।

भो आणवेदु मिस्सो।

(भो आज्ञापयतु मिश्रः।)

अस्ज्जनमिश्रः : संज्ञां प्राप्य।

राष्ट्रं समस्तं कपटेन भुक्तं

धूर्तक्रियाभिर्दयितेयमाप्ता।

भवान् विनीतो मिलितश्च शिष्यः

नातः परं नः प्रियमस्ति लोके॥४८॥

तथापीदमस्तु।

काले संततवर्षिणो जलमुचः शस्यैः समृद्धा धरा

भूपाला निजधर्मपालनपरा विप्रास्त्रयीनिर्भराः।

स्वादुक्षीरनतोधसः प्रतिदिनं गावो निरस्तापदः

सन्तः शान्तिपरा भवन्तु कृतिनः सौजन्यभाजो जनाः॥४९॥

इति निष्क्रांता सर्वे।

द्वितीय सन्धिः।

इति श्रीकविशेखराचार्यश्रीज्योतिरीश्वरविरचितं धूर्तसमागमाभिधं प्रहसनं समाप्तम्।

श्रीहरिः संवत् १९४० फाल्गुण कृष्णा ३० भौमवासरे श्रीहरिः श्रीश्रीश्रीश्रीश्री।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গানুবাদ

শ্রী গণেশকে নমস্কার।

শ্রী কৃষ্ণকে নমস্কার।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের সভায় উপস্থিত প্রীতিযুক্তা শ্বশ্রূমাতা দুহিতার পরিণয়ে আতপচাল দিয়ে আশীর্বাদ করার পর আনন্দহেতু জামাতার মস্তক চুম্বন করলে সেই মস্তকে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর (শ্বশ্রূমাতার) মুখ সংযুক্ত হওয়ায় শিব হলেন সহাস্য, সেইরকম স্মিত ও কল্যাণকরমুখবিশিষ্ট পঞ্চবক্ত্র তোমাদের রক্ষা করুন।(১)

তাছাড়াও

কমলসদৃশ আননে বিস্মিত, বক্ষোদেশে স্তবকিত (সপ্রশংস/ মঞ্জরিত), অধোদেশে বিস্ফারিত, চরণদ্বয়ে গ্রথিত, নয়নদ্বয়ে বিস্তৃত-পার্বতীর সমস্ত অঙ্গের বিচিত্র গতিসমূহ অনুসরণ করে মদনশরবিদ্ধ শিবের নেত্রসমূহ তোমাদের মঙ্গলসাধন করুক।(২)

নান্দী পাঠের পর সূত্রধার।

অতিবিস্তারের প্রয়োজন নেই।

আজ,

যাঁর কারণে নানা যুদ্ধে রুদ্ধ ও পরাজিত সুরত্রাণের ত্রস্ত সৈন্যবাহিনীতে (রণক্ষেত্রে) নৃত্যরত ভয়ঙ্কর কবন্ধের দল ভূমিকে দলিত করছে, পর্বতকে ঘূর্ণিত করছে, তেজস্বী

রাজাদের দলের মাথার মুকুটে যিনি চরণপদ্ম ধারণ করেছেন, সেই কর্ণাটচূড়ামণি হলেন শ্রীনরসিংহদেব।(৩)

যে রাজার ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুর প্রতাপরূপ অগ্নির উত্তাপ বিপদ দূর করে, তাঁর সকল গুণের অনুকথনের পথকে আলোকিত করার ব্যাপারে আচার্য হলেন ধীরেশ্বর-বংশের তিলক, দাতা ও নির্মলচিত্ত শ্রীকবিশেখর যাঁর কবিতা আমার হৃদয়কে আশ্রয় করেছে।(৪)

সকল সঙ্গীতবিদ্যার প্রকাশে যাঁকে অভিনব ভরত বলা হয়, যাঁর করপল্লব মহাদেবের চরণপদ্মের বন্দনা করে, সকল ভাষা ও উপভাষায় রচিত রসিক কবিদের বাক্যরাশি যাঁর কণ্ঠের আভরণ, যাঁর নিরন্তর সোমরস পানে কষায়িত কণ্ঠে (উচ্চারিত) নিন্দায় পুনঃ পুনঃ নৃত্যশীল মীমাংসকদের মহোৎসব হয়, যিনি রামেশ্বরের পৌত্র, পূজনীয় পবিত্রকীর্তিসম্পন্ন ধীরেশ্বরের পুত্র, মহরশাসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখর শ্রীমৎপল্লী যার জন্মভূমি, সেই কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বরের দ্বারা নিজকৌতূহলবশতঃ *ধূর্তসমাগম* নামে প্রহসন অভিনয় করতে অনুমতি পেয়েছি। তাঁর আদেশ অবশ্যই ইষ্ট মালতীমালার মত আমার শিরোধার্য।

যথা,

তাঁর কীর্তিসমূহ কর্পূরের মত, অমৃতবিন্দুর মত, কমলার হাসির মত, হংসের মত, তুষারের মত, হিমালয়ের মত, শিলাবৃষ্টির মত, (মুক্তা)হারের মত আচরণ করে। ত্রিভুবনের অঙ্গনরূপ রঙ্গমঞ্চে ভঙ্গিল গতির প্রগলভতায় সম্মানিত চন্দ্রের কিরণচ্ছটার মত সেই কীর্তি জয়যুক্ত হোক।(৫)

তাছাড়াও,

দান ও অনুগ্রহে নিপুণ কবিশেখরের দ্বারা কোন্ স্বর্গবাসী দেবতা অর্চিত হন নি? কোন্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অর্চিত হন নি? কোন্ কবিই বা সন্তর্পিত বা পূজিত হন নি? প্রতিদিন কোন্ অর্থীই বা কৃতার্থ হন নি?(৬)

তাই প্রেয়সীকে ডেকে সঙ্গীত শুরু করছি।

নেপথ্যের অভিমুখে তাকিয়ে।

আর্যে! এদিকে একবার এসো।

নটী প্রবেশ করলেন।

নটী – আর্য! এই যে আমি। আদেশ করুন আর্য। কি আদেশ তা জানিয়ে অনুগ্রহ করুন।

সূত্রধার – আর্যে! তুমি কি জানো না?

যে কবি কৌতুকবশতঃ মাত্র একদিনের মধ্যে অতি শীঘ্র নানা রীতি ও অলংকার বিশিষ্ট চারশত শ্লোক রচনা করেছেন, যিনি পৃথিবীমণ্ডলাদিতেও চতুঃষষ্টি কলার নিধিরূপে খ্যাত, সেই কৃতিমান্ জ্যোতিরীশ (অর্থাৎ জ্যোতিরীশ্বর) সঙ্গীতশাস্ত্রের সাগররূপে বিজয়লাভ করেছেন।(৭)

তাঁর বিরচিত '*ধূর্তসমাগম*' নামক প্রহসনটি অভিনয় করতে যাচ্ছি।

তাই নাট্যের উপযুক্ত কিছু গাও।

নটী – আর্যে! কোন সময়কে উদ্দেশ্য করে গান করব?

সূত্রধার – প্রস্ফুটিত মালতীর ঘনমধুপানে আনন্দে উন্মত্ত ভ্রমরের রবে মুখর, কামদেবের উৎসাহবর্ধক বসন্তকালের যে রস, সেই শৃঙ্গারই এখানে প্রধান রস ।

তাই

প্রস্ফুটিত নবমল্লিকার কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, মঞ্জরিত আম্রবৃক্ষশ্রেণী থেকে রেণু নির্গত হচ্ছে, আনন্দিত কোকিলের কণ্ঠ থেকে মঙ্গলগীতি উচ্ছলিত হচ্ছে যে বসন্তে, সেই বসন্ত মুনিরও চিত্ত অপহরণ করে।(৮)

নটী – মলয় বাতাস আমের বন কম্পিত করছে, কামিগণ কোকিলের স্বর শুনে আমোদিত হচ্ছে, ভ্রমরেরা মধুপানে মত্ত এবং সর্বদিকে গমনকারী বাতাস সুরভিত।(৯)

এই গুরু বসন্তমাস কামবিহীন মুনিজনবর্গেরও ধৈর্য উৎপাটিত করে তাঁদের হৃদয়কে মন্মথের বশীভূত করে।(১০)

এই বলে দুজনে গান করতে লাগলেন।

নেপথ্যে-

দণ্ড ও কমণ্ডলুর দ্বারা ভূষিত হস্ত, সুললিততিলকবিভূষিত মস্তক, জঙ্গমলোভযুক্ত, কাষায়বস্ত্রশোভিত একজন নিকটে আসছেন।(১১)

নটী – আর্যে! ইনি কে? পরিধানের কাষায় বসন স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, দণ্ডকুণ্ডিকহস্ত ধূর্তের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে - এরকম দেখা যাচ্ছে।

সূত্রধার – আর্যে! তুমি জানো না?

জনসাধারণের মুখ থেকে শোনা যায়, অশ্বের মতো ক্রিয়াযুক্ত, আচারধর্মরহিত, গণিকাবিলাসী, ঊর্ধ্বে দীর্ঘতিলকযুক্ত, কমণ্ডলুদণ্ডহস্ত বিশ্বনগর উগ্র অহঙ্কার পোষণ করেন।(১২)

তাই এর দর্শন দূর থেকে পরিহার করা উচিত।

প্রস্তাবনা সমাপ্ত হল।

তারপর প্রবেশ করলেন বর্ণনানুসারী বিশ্বনগর, পিছনে একজন স্নাতক।

বিশ্বনগর – বৈরাগ্যের সঙ্গে -

যোগিগণ হৃদয়পদ্মের মাঝে যে নির্গুণ, নিষ্প্রপঞ্চ, একমাত্র ত্রিভুবনপতির ধ্যান করেন, আমি সেই জরারহিত, আদিদেব, একমাত্র জ্ঞানের বিষয়, উদার মধুসূদনকে সর্বদা চিন্তা করি।(১৩)

স্নাতক – চারিদিকে দেখে।

আহা! বসন্তের কী রমণীয়তা।

যেহেতু

রতিরসে নিপুণ, কামান্ধ, কান্তার রঙ্গে অনুরক্ত ভ্রমরেরা উন্মীলনোন্মুখ মধুপূর্ণ নবাঙ্কুরের রস সানুরাগে পান করছে, সেই সঙ্গে কোকিলেরা প্রিয়জনবিরহিণী কামিনীদের চেতনা হরণ করে ত্রিভুবনজয়ী কামদেবের কীর্তিগাথা গাইছে।(১৪)

তাছাড়াও

মলয়পর্বতের শীতল কামকেলি-সুখদায়ক মদন-সখা বাতাস কর্পূরকে পরাস্ত করে, পদ্মবনের সৌন্দর্যকে আলোড়িত করে, চন্দনবনের শাখাগুলিকে কম্পিত করে, ত্রৈলোক্যকে মোহিত করে, রতিক্রীড়ায় তন্বী রমণীর কামকেলিতে শব্দিত হয়ে সোচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে।(১৫)

তাই কী করে আমি এক শরীরের দ্বারা এই অত্যন্ত দুঃসহ বসন্তকালকে সহ্য করব?

এইভাবে বিমনা হবার অভিনয় করলেন।

বিশ্বনগর – স্নাতককে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

ওহে দুরাচার! চিন্তাভারে অবনতস্কন্ধ তোমায় কেন আজ অন্যরকম লাগছে?

যেমন –

ঘন ঘন নিঃশ্বাস, ক্ষীণদেহ, শূন্যদৃষ্টি, মুখচন্দ্রে ধূসরতা, গতিতে বৈকল্য, চিত্তে মলিনতা, অধিক বৈকল্যের জন্য তোমার মধ্যে কোনও চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না, তাই পঞ্চবাণ যেন তোমার পূর্বানুরূপ ধৈর্যকে অনাদর করছে এরূপই আমার মনে হচ্ছে।(১৬)

স্নাতক – লজ্জায় অধোমুখ হয়ে।

ভগবন্! অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আপনার সামনে প্রকাশ করা যায় না।

বিশ্বনগর – নিজের কথা বললে কোনও দোষ হয় না। তাই বল।

স্নাতক – প্রণাম করে।

ভগবন্! আজ আমি অতিপ্রত্যূষে নগরের পুষ্করিণীর পরিসরে দেবাঙ্গনাদের সৌন্দর্যকেও উপহাস করছে এরূপ অনঙ্গসেনা নামে এক বারাঙ্গনাকে দেখেছি। সেই থেকে সর্বত্র তাকেই দেখছি।

বিশ্বনগর – হাতে তালি দিয়ে উচ্চঃস্বরে হেসে।

বৎস! আজ আমিও সেখানেই সুরতপ্রিয়া নামে এক মাসোপবাসিনীকে (শ্লেষের মাধ্যমে মাসোপবাসিনী বলতে বারাঙ্গনাকেও বোঝায়) দেখেছি। তাকে অনুসন্ধান করতে করতে আমিও মর্মভেদী মদনবাণের দ্বারা বিদ্ধ।

যেমন-

আকাশে যেন সে অঙ্কিত, দিকে দিকে তার রূপ যেন ব্যাপ্ত, নেত্রলোমে সে যেন প্রতিবিম্বিত, এইভাবেই আমার মনে সে আশ্লিষ্ট ও নিবদ্ধ হয়ে আছে। সে আমার হৃদয়পদ্মে ভ্রমরীর মতো অত্যন্ত (রতি)ভাবপ্রধানা প্রিয়ারূপে বিরাজমানা, প্রিয়ের বিলাসভূমিতেই তার অবস্থান। কিন্তু তার নিবাস কোথায় তা আমার জানা নেই।(১৭)

উপরদিকে তাকিয়ে।

বৎস! মধ্যাহ্নে ভগবান সূর্যদেব মাথার উপর আরূঢ।

যেমন-

দিকচক্র মরীচিকার দ্বারা গ্রস্ত, আকাশও সূর্যের কিরণের দ্যুতিতে ব্যাপ্ত, পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহ তুষানলের মতো মনে হচ্ছে, পথিকেরা জলাশয় পরিবেষ্টিত বৃক্ষলতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে শুয়ে আছে, জলাশয়গুলি হাতীদের নিমজ্জনের ফলে রক্তবর্ণ হয়ে আলোড়িত।(১৮)

তাই ভিক্ষার জন্য এখানেই কোনও গৃহস্থকে অনুসরণ করি।

এই বলে পরিক্রমণ করতে লাগলেন।

স্নাতক – সামনে দেখে।

ভগবন্! দেখুন।

কোনও এক মহাধনবানের বাসভবন দেখা যাচ্ছে – সেখানে সাধুদের মুণ্ডসদৃশ বহু মহিষীর (বন্ধন)স্তম্ভে শোভিত চতুঃশাল রয়েছে, ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল বালক ও গোবৎস দ্বারা তা শোভিত, সেখানে পীনোন্নতস্তনহেতু অলস ও স্খলিতগতি রমণীদের মন্দ মন্দ সঞ্চরণে রমণীয় বাসগৃহের পরিসরে চেটিকাদের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেপথ্যে

লক্ষ্মীর (সম্পদের) ফিরে যাবার (ব্যয়িত হবার) চিন্তায় যাঁর সকলপ্রকার ভোগ বিঘ্নিত হয়েছে, সর্বদা বিস্তৃত ধনের চিন্তায় নিদ্রা যাঁর অপগত হয়েছে, পৃথিবীতে যাঁর নামগ্রহণ করা উচিত নয় বলে প্রসিদ্ধি আছে, তাঁরই গৃহ সম্মুখে শোভা পাচ্ছে।(১৯)

স্নাতক – আবার সামনে গিয়ে এইরকম জিজ্ঞাসা করলেন-

ওহে! নাগরিকেরা, কার এই বাসভবন?

আবার নেপথ্যে।

বিশ্বনগর – আঃ, এঁর নাম জানার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? আচ্ছা তাহলে শোনো। মৃতাঙ্গার ঠক্কুরের আশ্রম এটি। বৎস! আর দেরী করো না। ভবনের ভিতরে প্রবেশ করি।

এই বলে ভবনে প্রবেশের অভিনয় করে তাঁরা একান্তে অবস্থান করতে লাগলেন।

অনন্তর মলিনবেশে মৃতাঙ্গার প্রবেশ করলেন।

দানের অভ্যাস করলে কুবেরও অবশ্যই দরিদ্রতা প্রাপ্ত হন। অর্থবানরা বরং প্রাণ দান করতে পারে, কিন্তু অর্থীকে ধন দেওয়া যাবে না।(২০)

স্নাতক – নিকটে গিয়ে।

ওহে মহাব্রাহ্মণ! ভগবান বিশ্বনগর আপনাদের ভবনে ভিক্ষান্ন ভোজন করতে ইচ্ছা করেন।

মৃতাঙ্গার – স্বগত।

হায় দুর্ভাগ্য, নগরীর প্রথম সকল লোককে ত্যাগ করে আমার উপরেই ধূমকেতু এসে পড়ল! তাহলে আজ কী প্রতীকার হবে?

এরূপ চিন্তা করে প্রকাশ্যে সবিনয়ে বললেন।

আপনাদের মত নিষ্পাপদের যেখানে স্নেহের সহিত ভিক্ষা দেওয়া হবে, সেই ভবন নারায়ণমূর্তির সেবার জন্য ধন্য ও পবিত্র হয়ে উঠবে, কিন্তু আমার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের পত্নী, যিনি ভ্রাতার সঙ্গে সম্পর্কিতা দূতী, তিনি সন্তান প্রসব করেছেন, তাই (আমাদের) জননাশৌচ। আপনারা অন্যত্র যান।(২১)

বিশ্বনগর – স্বগত।

হায়, এই দুরাত্মার কী ছলনাপূর্বক ব্যবহার! তা হোক। এইভাবে বলি।

প্রকাশ্যে।

আমাদের মতো মুনিদের জননাশৌচদোষ কোথায়।

বায়ু স্পর্শদোষে দূষিত হয় না, অগ্নি দহনকর্মে দূষিত হয় না, জল মূত্র-বিষ্ঠার দ্বারা দূষিত হয় না এবং সন্ন্যাসী অন্নের দ্বারা দূষিত হয় না।(২২)

মৃতাঙ্গার – বিনয়ের সঙ্গে।

যদিও একথা ঠিক, তথাপি সম্ভব হচ্ছে না। দেখুন।

অনাবৃষ্টির ফলে কৃষি নষ্ট হয়েছে, রাষ্ট্রভঙ্গের ফলে ঋণাদি নাশ হয়েছে, স্বল্পলাভে বাণিজ্য চলছে, প্রাতরাশের কথা আর কি বলব!(২৩)

স্নাতক – ক্রোধের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়।

সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীর মূর্খতাকে ধিক!

তিনি না জানেন উত্তমগুণসম্পন্ন, সত্তাসম্পন্ন ধার্মিক কুলীনকে, না জানেন আচারনিষ্ঠ, কর্মকুশল, প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত মানুষকে, কারণ তিনি নীচ, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন জনকেই কৃপা করেন, সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীর এই স্বভাবটি নীচগুণসম্পন্ন তোমার দ্বারাই প্রমাণিত হয়।(২৪)

ওহে! নষ্টপরলোক, দুষ্টব্রাহ্মণ এইরূপ দুঃসহ মধ্যাহ্নে মহাধনবান তোমার কাছে ভিক্ষা চাওয়ার পর কোথায় আবার আমরা অন্যত্র গিয়ে ভিক্ষা চাইব।

মৃতাঙ্গার – প্রভু! আমার গৃহের উত্তরদিকে সুরতপ্রিয়া নাম্নী এক মাসোপবাসিনী বাস করেন। সেখানে যান।

এই বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

বিশ্বনগর – তাহলে তো আমাদের মনোরথ সফলই হয়েছে। এস সেখানেই যাওয়া যাক।

এই বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

স্নাতক – সম্মুখে দেখে ও গন্ধের আঘ্রাণ নিয়ে।

প্রভু! দেখুন দেখুন। এই সামনের বাড়ি থেকে উত্থিত চন্দনকাঠ, মুস্তঘাস, মেথির সঙ্গে রসুন, কুষ্ঠের (ওষধিবিশেষ) নিষ্পেষণজাত গন্ধ একে সেবন করছে। সুতরাং এটিই সুরতপ্রিয়ার বাসভবন বলে মনে করছি।

বিশ্বনগর – কিংবদন্তী আছে মাসোপবাসিনী বিদুষী হন। তাই এস, এর নিকটে যাওয়া যাক, এইবলে একান্তে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

তারপর সুরতপ্রিয়া প্রবেশ করলেন।

বহু দুঃখ ও চেষ্টার মাধ্যমে যে ধর্ম লাভ হয় তা আমার অভীষ্ট নয়। মোক্ষে আমার সুখ নেই তাও সত্য[১] অর্থ সব কিছু করতে পারে। আর কাম হল সকল কলার আশ্রয়।(২৫)

স্নাতক – নিকটে গিয়ে।

আর্য! আপনাদের অতিথি বিশ্বনগর এখানে উপস্থিত।

সুরতপ্রিয়া – চারিদিকে ঘুরে এবং দেখে।

কি! প্রভু! তাহলে নিকটে যাই।

১। সৌখ্যং মম নাস্তি সত্যম্ হলে ছন্দ থাকে, অর্থও থাকে, কিন্তু পুঁথিতে সৌখ্যং মম অস্তি সত্যম্ থাকায় ছন্দ ও অর্থ থাকছে না, তাই সৌখ্যং মম নাস্তি সত্যম্ এই পাঠ গ্রহণ করা হল।

নিকটে গিয়ে।

প্রভু! আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

বিশ্বনগর – সানন্দে।

আমার অভীষ্টভাজন হও।

সুরতপ্রিয়া – প্রভু! আপনার অনুগ্রহেই।

বিশ্বনগর – শীঘ্রই এরূপ হও।

সুরতপ্রিয়া – ভগবন্, আজ্ঞা করুন আমাকে কী করতে হবে ও দিতে হবে।

বিশ্বনগর – তোমার কীই বা অদেয় আছে। এখন আমাদেরকে ভিক্ষাই দাও।

সুরতপ্রিয়া – ভগবন্, কীরূপ ভিক্ষা দেব এবং কোন্ সময়ে কত পরিমাণ অন্ন দেব তা বলে দিন।

বিশ্বনগর – সানন্দে।

শোনো।

হে সুবদনে! মাংস, মাষকলাই, পটল, ঘোল, বড়ি, বেতুয়াশাক, বড়া, উত্তেজক পানীয়, বেশি করে মাছ, মুগডাল এইসব দিয়ে তৈরি রাশীকৃত নানা পদ, সুস্বাদু অন্ন, দুধ, ঘি, দই, নতুন কদলী, চিনি - সংক্ষেপে এই ভাবে আমাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা শীঘ্র কর।(২৬)

সুরতপ্রিয়া – হেসে।

স্বগত।

হুঁ, দেবশ্রেষ্ঠের অনুগ্রহে এই মহাত্মা নিজেকে বিসর্জনযোগ্য করে তুলেছেন।

প্রকাশ্যে।

কৃতাঞ্জলি হয়ে।

বিরহযুক্ত আমার এই শরীর, তাই ধর্মের ফলকেই প্রাণের একমাত্র সারবস্তু করেছি। হে উদারকীর্তি! সবই আপনি জানেন। বাহ্যবস্তুতে আস্থা কোথায়।(২৭)

তাই প্রভু! গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমি এদিকে ভিক্ষার ব্যবস্থা করি।

স্নাতক – ভগবন্! দেখুন।

সংস্কৃতকে আশ্রয় করে।

এই নারীর কেশরাজি পেকে গেছে, কপোলদ্বয় রুক্ষ ও ক্ষীণ, স্তনদ্বয় নিপতিত, নিতম্বপ্রদেশ শুষ্ক, স্মিতদৃষ্টিযুক্ত হাস্যযুক্তা, শিব শিব উচ্চারণকারিণী, আমাদের নয়নোৎসব সাধিত করছে, কি বলি, কীই বা করি, কে এই দুষ্টা জরাগ্রস্তা তাপসী।(২৮)

বিশ্বনগর – ওহে মূর্খ! কেন অসাধুজনের মতো প্রলাপ বকছ।

সুরতপ্রিয়ার প্রতি।

শুভে! পাকশালায় যান। আমরাও আসছি।

সুরতপ্রিয়া – প্রভু যা আদেশ করেন।

এই বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

স্নাতক – প্রভু! যতক্ষণ না ভিক্ষা প্রস্তুত হচ্ছে ততক্ষণ আপনি এখানেই থাকুন। এর মধ্যে আমি অনঙ্গসেনার কার্যকলাপ জেনে তাড়াতাড়ি আসছি।

বিশ্বনগর – বৎস! তোমার সঙ্গেই যাব।

এই বলে দুজনেই পরিক্রমণ করলেন।

স্নাতক – প্রভু! মূলনাশক নাপিতের গৃহের নিকটে অনঙ্গসেনার বাসভবন এরূপ আমি শুনেছি। তাই তদনুসারেই অন্বেষণ করি।

এগিয়ে গিয়ে ও দেখে।

প্রভু! দেখুন। এই অনঙ্গসেনাকে সুরবিলাসিনীর মতোই দেখাচ্ছে।

বিশ্বনগর – তাহলে এগিয়ে চলো। তার কাছেই যাই।

একান্তে দুজনে দাঁড়ালেন।

তারপর অনঙ্গসেনা প্রবেশ করলেন।

স্নাতক – হঠাৎ কাছে এসে।

প্রভু! দেখুন অনঙ্গসেনার লাবণ্যসৌন্দর্য।

নীলোৎপলের পাপড়ির সৌন্দর্যবিশিষ্ট নয়নদ্বয়, পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখানন, উন্নতস্তনভারহেতু দেহ কিঞ্চিৎ বক্র এবং বেদির মতো মধ্যস্থল কৃশ, সৌন্দর্যশোভাবিশিষ্টা এই রমণী মত্তগজেন্দ্রের মতো মন্দগতিসম্পন্না, অবশ্যই ইনি পঞ্চশরবিশিষ্ট কামদেবের মোহনলতা এবং শৃঙ্গাররসের সঞ্জীবনীস্বরূপা।(২৯)

বিশ্বনগর – স্বগত।

এই যে নয়নদ্বয়ের অঞ্জনভঙ্গির বক্রিমায় সহাস্য মুখপদ্মযুক্তা, এই যে অর্থপূর্ণ কলাবিলাসের আশ্রয়ভূতা, এই যে রমণীয় রোমোদ্গমসমন্বিতা কৃশাঙ্গী আমার ভাবভঙ্গী

দেখে নিজের শরীরকে লুকিয়ে রাখছে, এটা প্রায় বলেই দিচ্ছে যে এই অনঙ্গদেবের রচনাটির অবস্থান (হবে) (আমার) এই অঙ্কেই।(৩০)

প্রকাশ্যে।

যথাযথই লক্ষ করেছ।

যথা,

এর মুখপদ্মের মধু তীর্থের জল, নেত্রদ্বয় নবীন নীলপদ্ম, দন্তশ্রেণী ও নখগুলি বিস্তৃত অক্ষত (আতপচাল)সমূহ, রোমাবলী দূর্বা, উন্নত স্তনদ্বয় ফলযুগল, হাত পদ্মের পাপড়ি; এই নারী নিজের অঙ্গগুলির উপহার দ্বারাই যেন কামদেবের অর্চনা করতে মনস্থ করেছে।(৩১)

অনঙ্গসেনাকে লক্ষ করে।

পূর্বে প্রতিদিন যে তপশ্চর্যা করা হয়েছে, যে তীর্থযাত্রা করা হয়েছে, পুরুষোত্তমের বহু অর্চনায় যে চিত্ত কৃতার্থ হয়েছে, সেই কর্মের এই পরমানন্দজনক ফল পাওয়া হল। তাই শাস্ত্রকথারসেরই বা কী প্রয়োজন, স্বর্গ বা মোক্ষেরই বা কী প্রয়োজন?(৩২)

এই বলে কামাবস্থা অভিনয় করলেন।

স্নাতক – আনন্দ ও বৈরাগ্যের সঙ্গে।

স্বগত।

এই লম্পট ইঁদুরের গর্তে সাপের মতো প্রবেশ করেছে। যাই হোক। যুক্তিসম্মত কথার মাধ্যমে একে নিবারিত করব।

প্রকাশ্যে।

প্রভু! আপনি সংসারের সুখকে উপেক্ষা করেছেন, একমাত্র মোক্ষই আপনার ইষ্ট, কেন আপনি মরীচিকাতুল্য কামরসে পতিত হয়ে নিজেকে হত্যা করছেন। এই দুষ্টগণিকাপ্রসঙ্গ থেকে নিবারিত হোন।

বিশ্বনগর – স্বগত।

বৎস! তুমি কি দেখনি?

হরিণনয়নাদের বক্র দৃষ্টি যতক্ষণ না নৃত্য করে, ততক্ষণ জ্ঞানবানদের হৃদয়ে বিবেকের স্থান থাকে।(৩৩)

অনঙ্গসেনা – হেসে।

প্রভু! এই আমরা ধনের অধীন। এখানে অরণ্যে রোদন করে নিজেকে বিড়ম্বিত করছেন। বিশ্বনগর – প্রিয়ে!

আমাদের মতো সন্ন্যাসীদের কোথায় ধনসম্পত্তি! তাই আমার শরীরের যথাসুখ বিনিয়োগ করো।

অনুরাগের সহিত।

হে মৃণালদলসদৃশা কোমলবাহুদণ্ডবিশিষ্টা বালিকা, হে কুপিতানন বিশিষ্টা চণ্ডী, আমার প্রতি দৃষ্টি দাও, তোমার মুখপদ্ম দেখে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে, এই দরিদ্র সন্ন্যাসী কামসমুদ্রে শীঘ্রই পতিত হচ্ছে।(৩৪)

এই বলে কামাবস্থার অভিনয় করলেন।

স্নাতক - প্রভু! আপনি সংসারসুখকে উপেক্ষা করেছেন।

ইত্যাদি কথা আবার বলতে লাগলেন।

অনঙ্গসেনা – সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করে।

প্রভু ! এখানে বেশী অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই ।

মাৎসর্যহীন মানুষেরা বাগর্থানুসারে মোক্ষের পথকে ধ্যান করেন। শান্ত, প্রৌঢ়, কুলীন, হীন যে কোনো (মানুষের) বিষয়েই তাঁরা সমান। আসক্তি, বিদ্বেষ, মমত্ব, অহংকারে কলুষিত বুদ্ধি মানুষ, বেশ্যা, দেবতা, ভিক্ষু এরা কি কেউ নিত্য বস্তু? হায় হায়, কেন কামসাগরে নিমজ্জিত হবেন?(৩৫)

বিশ্বনগর – প্রিয়ে ! আমার শরীর গ্রহণ করো।

এই বলে আঁচল ধরলেন।

স্নাতক – হঠাৎ কাছে এসে।

ওহে! তোমার পরলোক বিনষ্ট হয়েছে, তুমি দুষ্ট পরিব্রাজক। এই রমণীকে আমি যেহেতু প্রথমে গ্রহণ করেছি, তাই ইনি তোমার পুত্রবধূ। এঁকে ছেড়ে দাও।

বিশ্বনগর – ধিক মূর্খ! ইনি আমার বধূ, তোমার গুরুপত্নী এবং মাতৃতুল্যা। তাই কেন এঁর পিছনে পড়েছ?

স্নাতক – ক্রোধের সহিত।

ওরে লম্পট! এই কথা বলছ বলে তোমার মস্তক আমি পাকা আলূর-ফলের মতো খণ্ড খণ্ড করব।

এইভাবে পরস্পর ঝগড়া করতে লাগলেন।

অনঙ্গসেনা – স্বগত।

কীভাবে যে ধূর্তদের হাতে পড়ে গেলাম। যাই হোক, এইরকম করে দেখি।

প্রকাশ্যে।

ওহে মহাশয়দ্বয়! আপনাদের এই মহাকলহের বিচার অসজ্জনমিশ্র করবেন।

বিশ্বনগর – প্রিয়ে! তাহলে তাই হোক।

স্নাতক – প্রিয়ে! আমি দশটাকা দেব। তাই সেটি গ্রহণ করে আমার মনোহর কিছু সম্পাদন কর।

এই বলে গ্রন্থি (গাঁট) দেখালেন।

বিশ্বনগর – গ্রন্থিদর্শনের প্রয়োজন নেই। এস। সেখানেই যাই।

এই বলে সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

প্রথম সন্ধি সমাপ্ত হল।

তারপর অসজ্জনমিশ্র এবং বিদূষক প্রবেশ করলেন।

অসজ্জনমিশ্র – আমোদের সঙ্গে।

এই ত্রিভুবনে ভোজন করা শ্রেষ্ঠ, তার থেকেও উত্তম রতিক্রীড়োৎসব, ভোজন হোক বা না হোক রতি বিনা জীবন থাকে না।(৩৬)

বৎস! বন্ধুবঞ্চক এস, শেখো।

বিদূষক – মহাশয় যা আদেশ করেন।

অসজ্জনমিশ্র – রমণীর মুখ(সুধা)পান, অলসলোচনে অবলোকন, কেলিক্রীড়ায় নারীর অঙ্গসঙ্গ, কুচকলসসমুৎপীড়নে বাহুভঙ্গী - এসবকেই নিজহৃদয়ে সংসারের বিকল্পহীন একমাত্র সার করো। তর্কবহুল তীক্ষ্ণবুদ্ধিগ্রাহ্য গ্রন্থরূপ কাঁথার ভারে তোমার কি প্রয়োজন?(৩৭)

বিদূষক – ওহে মহাশয়! পররমণীসম্ভোগের থেকেও পরভবনে সিঁদ কেটে যে অর্থ চুরি করা হয়, সেটাই ত্রিভুবনের সারবস্তু।

দেখুন।

কষ্ট করে নিজের ধন লোপ করে বাণিজ্যের কি প্রয়োজন, অথবা পশু ও ধনের জন্য নিয়ম ও আয়াস দ্বারা সাধ্য কৃষিকার্যেরই বা কি প্রয়োজন, মরণকালের মতো শ্রমসাধ্যা, চিন্তাকুলা বিদ্যারই বা কি ফল, ত্রিভুবনের একমাত্র সার হল পরের ধনহরণ এবং পাশাখেলার সুখ।(৩৮)

তাই এই ধূর্তপুরনগরে যেমন তুমি গুরু, তেমন আমি শিষ্য হলাম।

অসজ্জনমিশ্র – বৈরাগ্যের সঙ্গে।

এই নগরে আমাদের মতো শ্রোত্রিয়দের জীবনে ছলকপটের স্থান নেই। আটদিন ধরে কোনও কোনও ন্যায়বাদী (বিচারপ্রার্থী), কোনও কপটশ্রাদ্ধাচারী বা বেশ্যালাপ কিছুই দেখলাম না।

নেপথ্যে।

ওহে! অসজ্জনমিশ্রের নিকট জানানো হচ্ছে যে ন্যায়বিচারের জন্য বাদিদ্বয় দ্বারে উপস্থিত।

অসজ্জনমিশ্র – উচ্চৈঃস্বরে বললেন

বৎস বন্ধুবঞ্চক! বাদী দুইজনকে শীঘ্র প্রবেশ করাও।

বিদূষক বাইরে গিয়ে বিশ্বনগর, স্নাতক ও অনঙ্গসেনার সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করলেন।

অসজ্জনমিশ্র – বিশ্বনগর ও স্নাতককে দেখে।

স্বগত।

এ আবার কী অনর্থ উপস্থিত হল?

প্রকাশ্যে

প্রভু! আমরা আগন্তুক। তাই এখানে ভিক্ষার অবসর নেই।

বিদূষক – ওহে মহাশয়! এরাই বাদিদ্বয়। এদের কলহের বিচার করুন মহাশয়।

অসজ্জনমিশ্র – আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে।

প্রভু বিশ্বনগর ও স্নাতকের জন্য আসন নিয়ে এস।

বিদূষক সেরূপ করে সকলকে বসাল ।

অসজ্জনমিশ্র – কে অর্থী, কে প্রত্যর্থী?

স্নাতক – ভাষাপাদে আমি অর্থী, নিকরকরণে আচার্য।

অসজ্জনমিশ্র – ন্যায়বাদীর প্রথমে নিকর, পরে ভাষা ও উত্তরপাদ।

বিশ্বনগর – এই যে আমার সন্ন্যাস দণ্ড হল নিকর (বিচারের জন্য দেয় ধন)।

স্নাতক – এই যে আমার কুলক্রমপ্রাপ্ত ইন্দ্রাশন(শণের শুষ্ক বীজ) নিকরকরণের জন্য গ্রহণ করুন।

অসজ্জনমিশ্র – সগৌরবে গ্রহণ করে, আমোদের সঙ্গে আঘ্রাণ করে -

কিছুটা কাজে লাগতে পারে।

দোষবিনাশক, নিদ্রাকর, বুদ্ধিবিকাশক, ক্ষুধাকর, কামকলার অনুকূল ইন্দ্রাশন দৈববশে এখন আমি লাভ করলাম।(৩৯)

বিশ্বনগর – স্বাধীনযৌবনা, শোভনভ্রূবিশিষ্টা, সকল কামীদের মাননীয়া আমার প্রিয়া এর দ্বারা আক্রান্তা।(৪০)

অসজ্জনমিশ্র – মাটিতে ভাষা লিখে স্নাতকের প্রতি।

স্নাতক, শীঘ্র উত্তর দাও।

স্নাতক – এই রমণীকে আমিই প্রথমে দশটাকা দিয়ে দেখি, আমার এই দয়িতার উপর ইনি মন দিয়েছেন।(৪১)

অসজ্জনমিশ্র – উত্তর লেখ।

বিদূষক – ওহে মিশ্র! দেখুন অনঙ্গসেনার লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য।

চন্দ্রবিম্বের মত উজ্জ্বল আননবিশিষ্টা, নীলপদ্মতুল্য নয়নের চঞ্চল ক্রীড়াসম্পদ্‌যুক্তা , স্তনভারনতা, তনুমধ্যা - ইনি যেন প্রথমোদিত চন্দ্রকলার মতো।(৪২)

অসজ্জনমিশ্র – অনঙ্গসেনাকে দেখে।

অহো, সৃষ্টিকর্তার কী নির্মাণনৈপুন্য।

যথা-

নীল উল্লসিত খঞ্জনপক্ষীসদৃশ সুন্দর নয়নবিশিষ্টা, শরতের পূর্ণ চন্দ্রের মতো রম্যাননা, ত্রিজগতের মনোহর দিব্যমূর্তি যুক্তা, যেন কামদেবের বীরকীর্তির মত এই তরুণী জগতে শোভা পাচ্ছেন।(৪৩)

ওহে বাদিদ্বয়। বিবাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ এই অনঙ্গসেনাকে জয় ও পরাজয়ের মধ্যস্থের স্থানে রাখা হোক। এইরকম মধ্যস্থাবস্থার ক্ষেত্রে আমরা রাজার দ্বারা নিযুক্ত মধ্যস্থ।

এই বলে অনঙ্গসেনাকে আনিয়ে নিজের নিকট বসিয়ে তার হস্ত নিজের হৃদয়ে স্থাপিত করে বললেন।

বিকশিত পদ্মের কোষের মত শ্রীসম্পন্ন, কাম্যজনের অভীষ্ট সম্পদ্, চন্দ্রের কিরণ থেকে জাত চন্দ্রকান্ত ইত্যাদির মত শীতল, কস্তুরী ও কর্পূরের সৌরভে সুরভিত কোমল হস্ত মদন তাপ হরণ করে।(৪৪)

ক্ষণকাল বিচার করে, উচ্চঃস্বরে হেসে।

ওহে বাদিদ্বয়, এই রাজ্যে সর্পদ্বয়ের (লম্পটদ্বয়ের) মতো তোমাদের বিবাদ।

ইনি তোমারও নন, আপনারও নন, আমার সন্নিকটে অবস্থিতা এই সৌভাগ্যশালিনী নারী আমারই, পূর্বে ইনি আমার সঙ্গে স্বপ্নে কেলি করেছেন, সেই কারণে ইনি আমারই প্রিয়া।(৪৫)

বিদূষক – অনঙ্গসেনাকে দেখে।

জনান্তিকে।

ওহে সুন্দরী ! এই মিশ্রমহাশয় বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী নির্ধন, আর এই স্নাতক স্বেচ্ছাচারী। তাই এদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে সমাগমের মাধ্যমে তোমার যৌবন সফল হোক।

এই বলে নিজেকে দেখালেন।

অনঙ্গসেনা – অল্প হেসে।

এ তো *ধূর্তসমাগম* প্রহসনে পরিণত হল।

বিশ্বনগর – বৈরাগ্যের সহিত।

ওহে বৎস দুরাচার, জলৌকার অঙ্গে জলৌকা সংলগ্ন হয় না (জোঁক জোঁকের রক্ত শোষণ করে না)। এই বিচার মূলনাশকের। সুতরাং এস, সুরতপ্রিয়ার গৃহেই যাই।

এই বলে দুজনে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তারপর পর্দা সরিয়ে মূলনাশক প্রবেশ করল।

ওরে, ওরে, অনঙ্গসেনা ! তোমার চরিত্র জানা আছে, কামদেবের মন্দিরে ক্ষৌরকর্ম করার পর বারবার বেতন প্রার্থনা করে বহুবার আমি তোমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছি। তাই এখন দাও। অন্যথা তোমাকে রাজদণ্ড দেব।

অনঙ্গসেনা – মূলনাশক, এখনই অসজ্জনমিশ্রের কাছ থেকে নিয়ে তোমাকে দেব। তাই স্থির হও।

বিদূষক – কে এই বিশ্রী দেখতে দুষ্টচরিত্র দুষ্টবচন ব্যক্তি?

অসজ্জনমিশ্র – একে চেনেন না?

দেখুন-

ঠোঁট ও নাক ছিন্ন, গলগণ্ডহেতু ঝুঁকে পড়েছে, বাম চোখ কাণা, একটি হাত গলিত, ডান পায়ে গোদ হয়েছে, এ হল মূলনাশ নাপিত।(৪৬)

মূলনাশক হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সকলের কাছে প্রমাণস্বরূপ আয়না দেখাতে লাগল।

অসজ্জনমিশ্র – মূলনাশক! আমাদের নখ ও লোম পরিষ্কার করে দাও।

মূলনাশক – প্রথমে বেতন দিন।

অসজ্জনমিশ্র- মূলনাশক! কিসের জন্য?

মূলনাশক – ওহে, তুমি যদি পরিস্খলিত হয়ে আগেই মরে যাও তাহলে বেতন কে দেবে?

অসজ্জনমিশ্র – পরিহাসের প্রয়োজন নেই। পারিতোষিক গ্রহণ কর এই বলে পেটিকা থেকে গঞ্জাঙ্কিণী তাকে দিলেন।

মূলনাশক – সগৌরবে তা গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে তার আঘ্রাণ নিয়ে মিশ্রের হাত-পা বেঁধে কাজের অভিনয় করলেন।

অসজ্জনমিশ্র – বেদনার সঙ্গে।

আমার হৃদয় দলিত হচ্ছে, চিত্ত মোহগ্রস্ত, সকল শরীরের হাড়ের গ্রন্থিসন্ধি যেন বেরিয়ে আসছে, এই শিল্পকর্ম থেকে ওহে মূলনাশ তুমি বিরত হও, শিব শিব শিব, আমার জীবন যেন এখনই বেরিয়ে যাচ্ছে।(৪৭)

এই বলে মূর্চ্ছিত হলেন।

মূলনাশক – নাড়িয়ে দিয়ে।

একি অসজ্জনমিশ্র মরে গেলেন নাকি! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই।

এই বলে বেরিয়ে গেলেন।

বিদূষক – মিশ্রের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে।

ওহে মিশ্র! আদেশ করুন।

অসজ্জনমিশ্র – জ্ঞান ফিরে পেয়ে।

সমগ্র রাষ্ট্র কপটের দ্বারা ভুক্ত, ধূর্তক্রিয়ার দ্বারা এই দয়িতাকে পাওয়া গেছে, আপনি বিনীত, শিষ্যও পাওয়া গেছে। এরপর আমার জগতে আর কোন কিছুই প্রিয় নেই।(৪৮)

তবুও এরূপ হোক।

যথাসময়ে মেঘের সদাবর্ষণে শস্যে সমৃদ্ধা হোক পৃথিবী, ভূপালগণ নিজধর্মপালনে ব্যাপৃত থাকুন, ব্রাহ্মণেরা ত্রয়ী নির্ভরশীল হন, প্রতিদিন গরুরা স্বাদু ক্ষীর দান করুক, সজ্জনেরা শান্তিপরায়ণ হোন, কৃতী মানুষেরা সৌজন্যভাজন হোন।(৪৯)

এই বলে সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দ্বিতীয় সন্ধি সমাপ্ত।

শ্রীকবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত *ধূর্তসমাগম* নামক প্রহসন সমাপ্ত হল।

শ্রীহরি ১৯৪০ সংবৎ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে ৩০ তারিখ ভৌমবাসর। শ্রীহরি শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী।

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রহসনের স্থান

সংস্কৃত কাব্যের ভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে আলংকারিকেরা নানা নিরিখে তার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ভাষা, গদ্য-পদ্য মাধ্যম, দৃশ্য-শ্রব্যত্ব – নানা মাপকাঠিতে কাব্যকে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে দৃশ্য-শ্রব্যত্ব ভেদে কাব্যের দুটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। যে কাব্য কেবল শোনা হয় তা শ্রব্য আর যা মঞ্চে দেখার জন্য উপস্থাপিত হয় তা দৃশ্য। এখানে মনে রাখা দরকার, দৃশ্য কাব্য শুধুই দৃশ্য নয়, তার শ্রব্যত্বও দৃশ্যত্বের সমান দাবি রাখে। এই দুটির সমন্বয়হেতু দৃশ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। শ্রব্যকাব্যের কবি আপন কল্পলোকে বাস করে যে কাব্য রচনা করেন তার রসাস্বাদন ও উপভোগ মুষ্টিমেয় কাব্যরসিক শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু অভিনয়প্রধান দৃশ্যকাব্য কবি বৃহত্তর দর্শকসমাজের জন্য রচনা করেন। নাট্যকারকে তাই তাঁর রচনায় উত্তম কাব্যের সঙ্গে গতিময়তা ও আকর্ষক ঘটনাবলির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। কাব্যের মতই নাট্যের বিষয়বস্তুও বিবিধপ্রকার হতে পারে। তা যেমন রাজকীয় বা উচ্চতর বর্গের চরিত্রসমূহকে কেন্দ্র করে রচিত হতে পারে, তেমনি সমাজের তথাকথিত নিম্নতর বা নিন্দিত শ্রেণীর মানুষরাও তার বিষয়বস্তুর মর্যাদা পেতে পারে। আর এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে হয় নাট্যকারকে। এর জন্য তাঁকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিকে চিত্রিত করতে হয় কেবল সংলাপ ও মঞ্চনির্দেশনার মাধ্যমে। এইখানেই কবিকেও মনুষ্যসাধারণের সঙ্গে একাসনে বসিতে হয় – ব্যক্তিমানসের উৎকৃষ্ট ভাব, উৎকৃষ্ট চিন্তা বা ঋষিসুলভ দিব্যদৃষ্টির অভিমান ত্যাগ করিতে হয়, আর্টের ডিমোক্রেসী যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে। যে নাটক

রঙ্গালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, তাহা নাটকই নয়।[১] আলংকারিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও নাট্যসাহিত্যের প্রাশস্ত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই নাট্যসাহিত্য বা দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস চিররহস্যাবৃত। এই বিষয়ে নানা মত লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো মতের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকলেও সর্বাংশে সত্য ও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজও সম্ভব হয়নি।

নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক উপলব্ধ গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হল আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র।* আচার্য ভরতের মতে ত্রিলোকের ভাবসমূহকে অনুকরণ করার নামই হল নাট্য।

ত্রৈলোকস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।[২]

আবার ভরত মানুষের প্রবৃত্তির অনুকরণকেই নাট্য নামে অভিহিত করেছেন।

লোকাবৃত্তানুকরণং নাট্যম্।[৩]

আচার্য ধনঞ্জয় অবস্থার অনুকৃতিকেই নাট্য বলেছেন।

অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্।[৪]

এই নাট্যের আরেক নাম হল রূপ। দর্শনযোগ্যতার জন্য নাট্য ‘রূপ’ নামে অভিহিত।

The general term for all dramatic compositions is Rupaka,- from rupa,form,- it being their chief object to embody characters and feelings, and to exhibit the natural indications of passion. A play is also defined, a Poem that is to be seen, or a Poem that is to be seen and heard.[৫]

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন রূপের আরোপ করা হয় বলে দৃশ্যকাব্যের আরেক নাম রূপক।

তদ্‌রূপারোপাত্তু রূপকম্।[৬]

প্রধান শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য রূপক আর অপ্রধান বা গৌণ শ্রেণীর দৃশকাব্য হল উপরূপক।

এই রূপককে দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়– নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। প্রায় সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করে নিয়েছেন যে রূপক এই দশপ্রকারই। রূপকের এই দশপ্রকার বিভাগ প্রধানতঃ হয়েছিল বিষয়বস্তু, নামকরণ ইত্যাদির বিভিন্নতা অনুসারে।

আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন –

নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যাযোগসমবকারডিমাঃ।

ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ।।[৭]

আচার্য ধনঞ্জয় বলেছেন –

নাটকং সপ্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ ।

ব্যাযোগসমবকারৌ বীথ্যঙ্কেহামৃগা ইতি।।[৮]

This ten-fold division is based mainly on the plot, the type of the hero, and the sentiment of the play, as pointed out by Dhananjaya (Dasarupaka, ch.1), the author of the Dasarupaka, an authoritative treatise on Dramaturgy.[৯]

এই দশটি রূপককে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এই দশটি রূপক আবার দুটি ভাগে বিভক্ত– বীরত্বপ্রধান আর সামাজিক। নাটক, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ ও অঙ্ক এই ছয়টি রূপক বীরত্বপ্রধান, আর প্রকরণ, প্রহসন, ভাণ ও বীথী মূলতঃ সমাজকেন্দ্রিক। ক্রমটিকে পালটে দিলে ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রকৃত চেহারাটি দেখা যাবে।

An examination of these ten types shows that they fall into two definite classes, the heroic and the social. Nataka, Vyayoga, Samavakara, Dima, Ihamrga and Anka from the heroic type, while Prakarana, Prahasana, Bhana and Vithi go naturally together as representing the social type. If the order is reversed the actual line of historical evolution can be noticed.[১০]

সংস্কৃত প্রহসন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল যা হাস্যরস সৃষ্টি করে এবং যা হাস্যরসপূর্ণ।

The word ‘Prahasana’ in Sanskrit means ‘What evokes laughter’ and ‘What is full of laughter.[১১]

আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* ও আচার্য ধনঞ্জয় রচিত *দশরূপক* গ্রন্থে প্রহসনের সম্পূর্ণ লক্ষণ না পাওয়া গেলেও আচার্য বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রহসনের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ভাণ শ্রেণীর রূপকের মতোই প্রহসনে সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ ও অঙ্ক থাকে। এর বিষয়বস্তু কবিকল্পিত, নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের ব্যাপার এখানে উপস্থাপিত হয়। এতে আরভটী বৃত্তি, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকে না। হাস্যরসই প্রহসনের অঙ্গীরস, বীথ্যঙ্গগুলি কোথাও থাকে, কোথাও থাকে না।

ভাণবত্ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্মিতম্।

ভবেত্ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্।।

অত্র নারভটী নাপি বিষ্কম্ভক-প্রবেশকৌ।

অঙ্গী হাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতির্নবা।।[১২]

তপস্বী, ব্রহ্মজ্ঞ বা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর চরিত্রগুলির যে কোনও একজন এর নায়ক হবেন।

তপস্বী ভগবদ্বিপ্রপ্রভৃতিস্ত্বত্র নাযকঃ।[১৩]

প্রহসনের বিভাগ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বলা হয়েছে যেখানে একজন ধৃষ্ট নায়ক থাকে তাকে শুদ্ধ প্রহসন বলে।

একো যত্র ভবেদ্ধৃষ্টো হাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে।

আশ্রিত্য কঞ্চন জনং সংকীর্ণমিতি তদ্বিদুঃ।।[১৪]

ধৃষ্ট ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত প্রহসনকে সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন বলে। আবার অনেকের মতে যে প্রহসনে বহু ধৃষ্ট চরিত্র বর্ণিত হয় তাকে সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন বলে। এই জাতীয় প্রহসন একটি বা দুটি অঙ্কে রচিত হয়।

বৃত্তং বহূনাং ধৃষ্টানাং সংকীর্ণং কেচিদূচিরে।

তত্ পুর্নভবতি দ্ব্যঙ্কমথবৈকাঙ্কনির্মিতম্।।[১৫]

কিন্তু ভরতমুনি বলেছেন, যে প্রহসনে বেশ্যা, চেট, নপুংসক, বিট, ধূর্ত ও সুদখোরের বৃত্তান্ত থাকে এবং তাদের স্বাভাবিক বেশভূষা ও আচরণের বর্ণনা থাকে তাকে সংকীর্ণ প্রহসন বলে।

বেশ্যাচেটনপুংসকধূর্তবিটা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।

অনিভৃতবেষপরিচ্ছদচেষ্টাকরণাত্তু সঙ্কীর্ণম্।।[১৬]

আবার যে প্রহসনে ক্লীব, কঞ্চুকী ও তপস্বী, বিট, চারণ ও যোদ্ধা প্রভৃতির বেশ ও ভাষা অবলম্বন করে অভিনয় করা হয় তাকে বিকৃত প্রহসন বলে।

বিকৃতং তু বিদুর্যত্র ষণ্ডকঞ্চুকিতাপসাঃ।

ভুজঙ্গচারণভট-প্রভৃতের্বেশবাগ্‌যুতাঃ"।।[১৭]

আচার্য ধনঞ্জয় *দশরূপক* গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশে প্রহসনের লক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু না বললেও প্রহসনের বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রহসন শুদ্ধ, বিকৃত ও সংকর তিন প্রকার।

তদ্বত্ প্রহসনং ত্রেধা শুদ্ধবৈকতসংকরৈঃ।[১৮]

'তদ্বত্' বলতে ভাণের ন্যায় বস্তু, সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গ, লাস্য প্রভৃতির কথা বোঝানো হয়েছে। পাখণ্ডি, ব্রাহ্মণ, চেট, চেটী, বিট প্রভৃতি চরিত্রসংকুল, যেখানে এদের বেশভূষা, ভাষা প্রভৃতির অনুরূপ চেষ্টা এবং হাস্যরসযুক্ত বাক্য থাকে সেখানে শুদ্ধ প্রহসন হয়।

পাখণ্ডিবিপ্রপ্রভৃতিচেটচেটীবিটাকুলম্।

চেষ্টিতং বেষভাষাভিঃ শুদ্ধং হাস্যবচো'ন্বিতম্।।[১৯]

আবার ষণ্ঢ বা নপুংসক, কঞ্চুকী অথবা তাপস কামুক ব্যক্তির বাক্য এবং বেশভূষা ব্যবহার করলে বিকৃত প্রহসন হয়। বীথ্যঙ্গের দ্বারা মিশ্রিত এবং ধূর্তচরিত্র-সংকুল প্রহসন হল সংকীর্ণ।

কামুকাদিবচোবেষৈঃ ষণ্ঢকঞ্চুকিতাপসৈঃ।

বিকৃতং সঙ্করাদ্ বীথ্যা সংকীর্ণং ধূর্তসংকুলম্।।[২০]

প্রহসন হাস্যরসাত্মক অপরূপ এক দৃশ্যকাব্য। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন কোনো নষ্টাচার, ভ্রষ্টাচারে ব্যভিচারদুষ্ট হয়ে পড়েন, সমাজের যখন সার্বিক অধঃপতন ঘটে তখনই জন্ম নেয় প্রহসন জাতীয় ব্যঙ্গসাহিত্য। উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ, অস্বাভাবিক বেশভূষা নিয়ে হাস্যরস পরিবেশিত হয় প্রহসনে। এতে ভাণ শ্রেণীর রূপকের মতো মুখ ও নির্বহণ সন্ধি, দশটি লাস্যাঙ্গ ও একটি অঙ্ক থাকে। এর ইতিবৃত্ত হয় কবিকল্পিত। সাধারণতঃ নিন্দিত ব্যক্তির ইতিবৃত্তই এখানে বর্ণিত হয়। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, আরভটী বৃত্তি এখানে থাকে না এবং হাস্যরসই এর অঙ্গী রস হয়। আচার্য বিশ্বনাথ কারিকাংশে বলেছেন প্রহসনের ক্ষেত্রে বীথ্যঙ্গ থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

বীথ্যঙ্গানাং স্থিতির্নবা।[২১]

আচার্য ধনঞ্জয় ও আচার্য বিশ্বনাথ শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও বিকৃত ভেদে প্রহসনের তিনটি ভেদ স্বীকার করলেও মহর্ষি ভরত ও আচার্য সাগরনন্দী বলেছেন প্রহসন শুদ্ধ ও সংকীর্ণ ভেদে দুই প্রকার। শুদ্ধ প্রহসন অভিনীত হয় পরিব্রাজক, তাপস, সিদ্ধ, দ্বিজ অথবা হাস্যকুশল অন্যান্য পাত্রের দ্বারা। সংকীর্ণ প্রহসন অভিনীত হয় বেশ্যা, বিট, নপুংসক,

দাস প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী দ্বারা। আচার্য সাগর নন্দীর মতানুসারে প্রহসনে দুটি অঙ্ক থাকে এবং দুটি সন্ধি মুখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকে।

অস্য চ দ্বাবঙ্কৌ ভবতো মুখনির্বহণসন্ধিদ্বযং চ।[২২]

There is a marked difference in the theme of the प्रहसनs that are included in modern Sanskrit Literature. Most of the modern Sanskrit prahasanas are satirical in nature. In most cases हास्य (satire) is the predominant rasa and शृङ्गार is conspicuous by its absence. In some cases there are more than one act.[২৩]

চতুর্থ অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী

১। মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্যবিচার*, পৃ. ১৪৭।

২। ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, প্রথম অধ্যায়, কারিকা(কা.) ১০৬।

৩। *তদেব*, কা. ১১১।

৪। ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, প্রথম প্রকাশ, কা. ৭।

৫। হোরেস্ হেম্যান উইলসন, *থিয়েটার অফ্ দি হিন্দুস্*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৬। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ১।

৭। *তদেব*, কা. ৩।

৮। ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, প্রথম প্রকাশ, কা. ৮।

৯। কে.কে.মালাঠি দেবী, *প্রহসনস্ ইন সংস্কৃত লিটারেচার অ্যান্ড কেরালা স্টেজ*, পৃ. ২।

১০। *তদেব*, পৃ. ৪।

১১। *তদেব*, পৃ. ৬।

১২। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ২৬৪-২৬৫।

১৩। *তদেব*, কা. ২৬৬।

১৪। *তদেব*, কা. ২৬৬।

১৫। *তদেব*, কা. ২৬৭।

১৬। ভরত, *নাট্যশাস্ত্র,* বিংশ অধ্যায়, কা. ১০৫।

১৭। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ২৬৮।

১৮। ধনঞ্জয়, *দশরূপক,* তৃতীয় প্রকাশ, কা. ৫৪।

১৯। *তদেব,* কা. ৫৪-৫৫।

২০। *তদেব,* কা. ৫৫-৫৬।

২১। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ২৬৫।

২২। সাগরনন্দী, *নাটকলক্ষণরত্নকোশ,* কা. ২৯৬।

২৩। ঋতা চট্টোপাধ্যায় এবং বিজয়া গোস্বামী, *এনসাইক্লোপেডিয়া অফ্ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান ড্রামাটার্জি,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

পঞ্চম অধ্যায়

নাট্যতত্ত্বের আলোকে *ধূর্তসমাগম* প্রহসনের বিশ্লেষণ

প্রায় সব আলংকারিকেরাই রূপকের দশটি শ্রেণীর মধ্যে প্রহসনকে স্থান দিয়েছেন। কোনও কোনও আলংকারিক প্রহসনের লক্ষণ না দিয়ে শুধু এর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। আবার কোনও কোনও আলংকারিক প্রহসনের লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ দুইই করেছেন। তাঁদের মধ্যে আচার্য ভরত, বিশ্বনাথ, ধনঞ্জয় ও সাগরনন্দীর মতকে একত্র করে প্রহসনের একটি সার্বিক বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রহসনের বিষয়বস্তু হবে কবিকল্পিত। উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ, অস্বাভাবিক বেশভূষার মাধ্যমে সাধারণতঃ নিন্দিত ব্যক্তির কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়। এর নায়ক হবেন তপস্বী, ব্রহ্মজ্ঞ বা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন একজন। প্রহসনে সাধারণতঃ একটি অঙ্ক থাকে, আবার কখনও দুটি অঙ্কও থাকতে পারে। এখানে হাস্যরস হল প্রধান রস। ভাণ শ্রেণীর রূপকের মতো প্রহসনে দুটি সন্ধি (মুখ ও নির্বহণ), সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ থাকে। আরভটী বৃত্তি, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক এই জাতীয় রূপকে থাকে না। বীথ্যঙ্গ কোথাও থাকে, কোথাও থাকে না।

শুদ্ধ ও সংকীর্ণ নামক বিভাগদ্বয় সকলে স্বীকার করে নিলেও বিকৃত নামক তৃতীয় বিভাগ শুধুমাত্র আচার্য বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় স্বীকার করেন।[১] আচার্য বিশ্বনাথের মতে ক্লীব, কঞ্চুকী, তপস্বী, বিট, চারণ ও যোদ্ধা প্রভৃতির বেশ ও ভাষা অবলম্বনে রচিত প্রহসন হল বিকৃত শ্রেণীর প্রহসন।[২] আর ধনঞ্জয়ের মতে নপুংসক, কঞ্চুকী, তাপস,

কামুক ব্যক্তির বাক্য এবং বেশভূষা ব্যবহার করলে বিকৃত প্রহসন হয়।[৩] আচার্য ভরতের মতে ভগবৎ, তাপস, ভিক্ষু, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অতিশয় হাস্যপূর্ণ, নীচ লোকের পরিহাস ও সম্ভাষণবহুল, অবিকৃত ভাষা ও আচার, বিশেষ হাস্য উপহাসপূর্ণ পদসমূহ যেখানে থাকে তাই হল শুদ্ধ জাতীয় প্রহসন।[৪] আবার সাগরনন্দীর মতে পরিব্রাজক, তাপস, সিদ্ধ, দ্বিজ বা হাস্যকুশল অন্যান্য পাত্র দ্বারা বর্ণিত প্রহসন শুদ্ধ প্রহসন।[৫] বিশ্বনাথের মতে একজন ধৃষ্ট নায়ক যেখানে থাকেন তাই হল শুদ্ধ শ্রেণীর প্রহসন।[৬] আর ধনঞ্জয়ের মতে পাখণ্ডি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি, চেট, চেটী, বিট প্রভৃতি চরিত্রদের বেশভূষা, ভাষা প্রভৃতির অনুরূপ চেষ্টা এবং হাস্যরসযুক্ত বাক্য থাকলে শুদ্ধপ্রহসন হয়।[৭] আচার্য ভরত বলেছেন বেশ্যা, চেট, নপুংসক, বিট, ধূর্ত, দুশ্চরিত্রা নারী এবং এদের বেশভূষা ও কার্যকলাপ যেখানে বর্ণিত তাই সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন।[৮] আবার সাগরনন্দীর মতে বেশ্যা, চেট, নপুংসক, দাস প্রভৃতি পাত্র দ্বারা বর্ণিত প্রহসন সংকীর্ণ শ্রেণীর।[৯] বিশ্বনাথের মতানুযায়ী ধৃষ্ট ছাড়া অপর ব্যক্তিকে আশ্রয় করে বা বহু ধৃষ্ট চরিত্রকে নিয়ে সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন রচিত হয়।[১০] বীথ্যঙ্গের দ্বারা মিশ্রিত, ধূর্তচরিত্রসংকুল প্রহসন ধনঞ্জয়ের মতানুযায়ী সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন।[১১]

ধূর্তসমাগম নামক প্রহসনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভাবে কবিকল্পিত। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর নিজ কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন এই প্রহসনে। বেশিরভাগ প্রহসনে একটি অঙ্ক থাকলেও এই প্রহসনে দুটি অঙ্ক আছে। দৃশ্যকাব্যের নিয়মানুযায়ী এখানে বিভাগগুলির নাম অঙ্ক রাখা হয়নি। এই প্রহসনে প্রথম বিভাগের শেষে প্রথম সন্ধি সমাপ্ত এবং দ্বিতীয় বিভাগের শেষে দ্বিতীয় সন্ধি সমাপ্ত এইরকম বলা হয়েছে। এখানে সন্ধি বলতে অবশ্য দৃশ্যকাব্যের মুখসন্ধি ইত্যাদি যে পাঁচটি সন্ধি থাকে তাদের কথা বলা হয়নি। দৃশ্যকাব্যের এই সন্ধি নামক বিভাগগুলি

কখনও দৃশ্যকাব্যের মাঝে উল্লেখ করা থাকে না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আলোচ্য প্রহসনে সন্ধি বলতে অঙ্ক নামে প্রচলিত বিভাগগুলিকেই বোঝানো হয়েছে। তাই পরবর্তী অংশে সন্ধি না বলে এই প্রহসনের বিভাগগুলিকে অঙ্ক নামে অভিহিত করা হল। নিন্দিত ব্যক্তির ইতিবৃত্ত এখানে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী সমাজে পূজনীয় ব্যক্তি হলেও আলোচ্য প্রহসনে বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসী নিন্দনীয় চরিত্র। গণিকাপ্রীতি প্রভৃতি চরিত্রগত দোষের কারণে সে সকলের নিন্দাভাজন। তার দর্শন দূর থেকেও সকলে পরিহার করতে চাইত। গণিকাকে কেন্দ্র করে প্রায় সব পুরুষ চরিত্রগুলির উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণের বর্ণনা আমরা পাই। তাছাড়া বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসীর পরিধেয় বসন স্খলিত হয়ে যাচ্ছে এরকমভাবে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করলেন, যেটা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। এই প্রহসনের অঙ্গী রস হল হাস্যরস। প্রত্যেকটি চরিত্রের বর্ণনা, তাদের কথোপকথন সহৃদয় পাঠকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে।

অঙ্কে অদর্শনীয়, অনুচিত কোনও ঘটনা অর্থোপক্ষেপকের সাহায্যে দেখানো হয়।[১২] কিন্তু প্রহসনে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নামক অর্থোপক্ষেপক থাকে না।[১৩] আলোচ্য প্রহসনেও বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নামক অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োগ নেই। মায়া, ইন্দ্রজাল, ক্রোধোন্মত্ততা, দাম্ভিকতা, আক্রমণ, যুদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা উগ্র বৃত্তিকে আরভটী বৃত্তি বলা হয়।[১৪] প্রহসনে আরভটী বৃত্তি থাকে না।[১৫] আলোচ্য প্রহসনেও আরভটী বৃত্তি অনুপস্থিত।

প্রহসনের নায়ক হবেন তপস্বী, ব্রহ্মজ্ঞ বা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন একজন। আলোচ্য প্রহসনে সন্ন্যাসী শ্রেণীর চরিত্র নায়ক।

সন্ধি রূপকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাহিনীসূত্র যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে সেজন্যই রূপকে সন্ধি অপরিহার্য। ভাণের মত প্রহসনেও পাঁচ প্রকার সন্ধির মধ্যে শুধুমাত্র মুখ ও

নির্বহণ নামক দুটি সন্ধি থাকে।[১৬] আলোচ্য প্রহসনেও মুখ ও নির্বহণ নামক দুটি সন্ধি আছে। অল্পমাত্র প্রদর্শিত হলেও যে ঘটনা বহুভাবে বিস্তৃতিলাভ করে মুখ্যফললাভের প্রধান কারণ হয় তাকে বীজ নামক অর্থপ্রকৃতি বলা হয়।[১৭] আর মুখ্যফলসিদ্ধির জন্য যে ঔৎসুক্য তাকে আরম্ভ নামক অবস্থা বলা হয়।[১৮] এই বীজ নামক অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে আরম্ভ নামক অবস্থার মিলনে মুখসন্ধি হয়। আরম্ভ নামক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা বৃত্তান্ত ও রসসম্ভাবনাযুক্ত বীজের উৎপত্তি হয় যেখানে তাকে মুখসন্ধি বলে।[১৯] আলোচ্য প্রহসনের প্রথম অঙ্কে দেখা যায় যে বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসী ও সুরতপ্রিয়া নামক মাসোপবাসিনীর প্রণয় এই প্রহসনের মুখ্যফল। এই মুখ্যফলের হেতু অনুরাগরূপ বীজের সূচনা হয়েছে প্রথম অঙ্কে। অতএব প্রথম অঙ্ক মুখসন্ধির বিষয় হয়েছে। যেটি প্রধানভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তু সিদ্ধ হলে তবেই রূপকের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে কার্য নামক অর্থপ্রকৃতি হয়।[২০] আর সমগ্র ফলোদয় যে অবস্থায় সংঘটিত হয় তাকে ফলাগম নামক অবস্থা বলা হয়।[২১] এই কার্য নামক অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে ফলাগম নামক অবস্থার মিলনে নির্বহণসন্ধি হয়। মুখসন্ধিতে প্রতিপাদিত বিষয় যেখানে একটিমাত্র মুখ্যফললাভের উদ্দেশ্যে উপনীত হয় তার নাম নির্বহণসন্ধি।[২২] অন্য কোন সন্ধিতে মুখ্যফললাভ হতে পারে না, কেবলমাত্র নির্বহণসন্ধিতেই চরম ফলপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। আলোচ্য প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় বিশ্বনগর গণিকা অনঙ্গসেনাকে পাবার ব্যর্থ আশা ত্যাগ করে তার প্রথম পছন্দের রমণী সুরতপ্রিয়ার কাছেই চলে যায়। এইভাবে মুখ্যফললাভ সাধিত হওয়ায় দ্বিতীয় অঙ্ক নির্বহণসন্ধির বিষয় হয়েছে।

দৃশ্যকাব্যে দশটি লাস্যাঙ্গ থাকে। সেগুলি হল – গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিগূঢ়, উত্তমোত্তমক, উক্তপ্রত্যুক্ত।[২৩]

বিশ্বনাথের মতানুযায়ী বীণাদি তারযন্ত্র সহযোগে দেবতার সম্মুখে উপবেশন করে বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিবেশন করাকে গেয়পদ নামক লাস্যাঙ্গ বলে।

তন্ত্রীভাণ্ডং পুরস্কৃত্যোপবিষ্টস্যাসনে পুরঃ।

শুদ্ধং গানং গেযপদম্।।[২৪]

মদনসন্তাপিতা কোন রমণী যখন কোন স্থানে অবস্থান করে প্রাকৃত ভাষায় কোন শ্লোক পাঠ করেন তাকে স্থিতপাঠ্য বলে।

স্থিতপাঠ্যং তদুচ্যতে।

মদনোত্তাপিতা যত্র পঠতি প্রাকৃতং স্থিতা।।[২৫]

যেখানে শোকাভিভূতা ও চিন্তান্বিতা কোন রমণী অনলংকৃত দেহে প্রসাধন বর্জন করে এবং বীণাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে উপবিষ্টা হয়ে গান করে সেখানে আসীন নামক লাস্যাঙ্গ হয়।

নিখিলাতোদ্যরহিতং শোকচিন্তান্বিতাবলা।

অপ্রসাধিতগাত্রং যদাসীনাসীনমেব তত্।।[২৬]

স্ত্রীপুরুষ বিপরীতব্যবহারে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বিবিধ ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত গীত হলে পুষ্পগণ্ডিকা নামক লাস্যাঙ্গ হয়।

আতোদ্যমিশ্রিতং গেযং ছন্দাংসি বিবিধানি চ।

স্ত্রীপুংসযোর্বিপর্য্যাসচেষ্টিতং পুষ্পগণ্ডিকা।।[২৭]

স্বামীকে অন্য নারীতে আসক্ত ভেবে প্রেম-বিচ্ছেদজনিত কাতরতায় কোন স্ত্রী যদি বীণাদি বাদ্যযন্ত্রসহযোগে গান করে তাকে প্রচ্ছেদক নামক লাস্যাঙ্গ বলে।

অন্যাসক্তং পতিং মত্বা প্রেমবিচ্ছেদমন্যুনা।

বীণাপুরঃসরং গানং স্ত্রিযাঃ প্রচ্ছেদকো মতঃ।।[২৮]

নাটকের কোন পুরুষপাত্র যদি স্ত্রীবেশ ধারণ করে অল্পমাত্র শ্লক্ষ্ণ বা নিপুণ অভিনয় করে তাকে ত্রিগূঢ় নামে লাস্যাঙ্গ বলে।

স্ত্রীবেশধারিণাং পুংসাং নাট্যং শ্লক্ষ্ণং ত্রিগূঢকম্।[২৯]

সংকেতস্থানে নায়িকাকে অনুপস্থিত দেখে নায়ক যখন বীণাবাদনাদি দ্বারা প্রাকৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাকে সৈন্ধব নামক লাস্যাঙ্গ বলে।

কশ্চন ভ্রষ্টসংকেতঃ সুব্যক্তকরণান্বিতঃ।

প্রাকৃতং বচনং ব্যক্তি যত্র তত্ সৈন্ধবং মতম্।।[৩০]

মুখ বা প্রতিমুখসন্ধিতে স্থিত চতুষ্পাদযুক্ত, রস ও ভাব সমন্বিত সঙ্গীতকে দ্বিগূঢ় নামক লাস্যাঙ্গ বলে।

চতুরস্রপদং গীতং মুখপ্রতিমুখান্বিতম্।[৩১]

ক্রোধ বা অনুগ্রহজাত অধিক্ষেপ বা তিরস্কারযুক্ত রসসমৃদ্ধ সঙ্গীত হল উত্তমোত্তমক নামক লাস্যাঙ্গ।

উত্তমোত্তমকং পুনঃ।

কোপপ্রসাদজমধিক্ষেপযুক্তং রসোত্তরম্।।[৩২]

হাব ও হেলাভাবযুক্ত, বিচিত্র শ্লোকবন্ধে মনোহর, অলীক তিরস্কারযুক্ত, উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত বিলাসাদি রসসমৃদ্ধ সঙ্গীতকে উক্ত-প্রত্যুক্ত নামক লাস্যাঙ্গ বলা হয়।

হাবহেলান্বিতং চিত্রশ্লোকবন্ধমনোহরম্।

উক্তি-প্রত্যুক্তিসংযুক্তং সোপালম্ভমলীকবত্।

বিলাসান্বিতগীতার্থমুক্তপ্রত্যুক্তমুচ্যতে।।[৩৩]

এই দশটি লাস্যাঙ্গের সবকটি এই প্রহসনে দেখা যায় না। কেবলমাত্র স্থিতপাঠ্য নামক লাস্যাঙ্গ এই প্রহসনে দেখা যায়।

আলোচ্য প্রহসনের প্রথম অঙ্কে মদনসন্তাপিতা সুরতপ্রিয়া বলছেন যে তার মোক্ষ ও ধর্ম অভীষ্ট নয়, কাম তার কাছে সকল কলার আশ্রয়। এই শ্লোকটি মদনসন্তাপিতা সুরতপ্রিয়া প্রাকৃত ভাষায় পাঠ করেছেন। তাই এখানে স্থিতপাঠ্য নামক লাস্যাঙ্গ হয়েছে। স্থিতপাঠ্য ছাড়া বাকী নয়টি লাস্যাঙ্গ সঙ্গীতপ্রধান, কিন্তু এই প্রহসনে সঙ্গীত সেভাবে না থাকায় বাকী লাস্যাঙ্গগুলি এখানে হয়নি।

ভাণের মত প্রহসনেও সন্ধ্যঙ্গ থাকে।[৩৪] তার মধ্যে মুখসন্ধির বারোটি অঙ্গ এবং নির্বহণ সন্ধির চোদ্দটি অঙ্গ। মুখসন্ধির বারোটি অঙ্গ হল – উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, করণ ও ভেদ।[৩৫]

দৃশ্যকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বীজাকারে প্রথম উপস্থাপনাকে উপক্ষেপ বলা হয়।

কাব্যার্থস্য সমুত্পত্তিরুপক্ষেপ ইতি স্মৃতঃ।

কাব্যার্থ ইতিবৃত্তলক্ষণপ্রস্তুতাভিধেয়ঃ।।[৩৬]

সমুৎপন্ন কাব্যার্থের বাহুল্যকে পরিকর নামক সন্ধ্যঙ্গ বলা হয়।

সমুত্পন্নার্থবাহুল্যং জ্ঞেযঃ পরিকরঃ পুনঃ।[৩৭]

কাব্যার্থের নিষ্পত্তিকে পরিন্যাস নামক সন্ধ্যঙ্গ বলা হয়।

তন্নিষ্পত্তিঃ পরিন্যাসঃ।[৩৮]

এই প্রথম তিনটি সন্ধ্যঙ্গ ক্রমানুসারে সর্বদা থাকতেই হবে কিন্তু অন্য অঙ্গগুলি পরপর নাও থাকতে পারে। পাত্রবিশেষের বীরত্বশৌর্যবীর্যাদি গুণ বর্ণনাত্মক উক্তিকে বিলোভন নামক সন্ধ্যঙ্গ বলা হয়। এখানে নায়ক-নায়িকার গুণ বর্ণনার মাধ্যমে পরস্পরের অনুরাগ বর্দ্ধন করা হয়।

গুণাখ্যানং বিলোভনম্। [৩৯]

কর্তব্যের অবধারণকে যুক্তি বলা হয়।

সংপ্রধারণমর্থানাং যুক্তিঃ।[৪০]

নায়ক-নায়িকার সুখাগম হলে প্রাপ্তি নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়।

প্রাপ্তিঃ সুখাগমঃ।[৪১]

যেখানে বীজের আগমন ঘটে তাকে সমাধান নামক সন্ধ্যঙ্গ বলে।

বীজস্যাগমনং যত্তু তত্সমাধানমুচ্যতে।[৪২]

সুখ-দুঃখের উৎপাদনকারী বিষয়ের নাম বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গ।

সুখদুঃখকৃতো যো’র্থস্তদ্বিধানমিতি স্মৃতম্।[৪৩]

কৌতুহলোদ্দীপক বাক্যের নাম পরিভাবনা নামক সন্ধ্যঙ্গ ।

কুতূহলোত্তরা বাচঃ প্রোক্তা তু পরিভাবনা।[৪৪]

বীজার্থের পুনরুৎপত্তি প্রদর্শিত হলে উদ্ভেদ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়।

বীজার্থস্য প্ররোহঃ স্যাদুদ্ভেদঃ।[৪৫]

প্রকৃত বিষয়ের সমারম্ভ বা পুনরারম্ভকে করণ নামক সন্ধ্যঙ্গ বলা হয়।

করণং পুনঃ।

প্রকৃতার্থসমারংভঃ।[৪৬]

বহুজনের মধ্যে একজনের পৃথকীকরণের নাম ভেদ নামক সন্ধ্যঙ্গ।

ভেদঃ সংহতভেদনম্।[৪৭]

এই বারোটি মুখসন্ধ্যঙ্গের মধ্যে সবকটি আলোচ্য প্রহসনে দেখা যায় না। শুধুমাত্র উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস ও বিধান এই প্রহসনে দেখা যায়। আলোচ্য প্রহসনের প্রথম অঙ্কে বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসী বলে যে সে মদনবাণের দ্বারা বিদ্ধ, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয় প্রথম বীজাকারে উপস্থিত হওযায় উপক্ষেপ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। তার প্রিয়া যেন আকাশে অঙ্কিত, তার রূপ যেন দিকে দিকে ব্যাপ্ত, সে যেন হৃদয়পদ্মে ভ্রমরীর মত বিরাজমানা এই ভাবে কাব্যার্থের বাহুল্য ঘটায় পরিকর নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে সেই প্রিয়া অর্থাৎ সুরতপ্রিয়ার ভবন অনুসন্ধান করতে পারায় তার মনোরথ সফলতা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে এখানে পরিন্যাস নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। আবার পরে দেখা যায় বিশ্বনগর গণিকা অনঙ্গসেনাকে দেখে তার রূপের প্রশংসা করে। নিজ প্রিয়ার রূপের প্রশংসা করতে দেখে স্নাতকের আনন্দ অনুভব হয়

আবার পরমুহূর্তেই সে যখন বুঝতে পারে যে বিশ্বনগর তারই প্রিয়াকে পেতে চাইছে তখন সে দুঃখ অনুভব করে। এইভাবে ক্রমে সুখ ও দুঃখ উৎপাদিত হওযায় বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নির্বহণ সন্ধির চোদ্দটি অঙ্গ হল – সন্ধি, বিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি।[৪৮]

বীজের পুনরাবির্ভাবকে সন্ধি নামক সন্ধ্যঙ্গ বলে।

বীজোপগমনং সন্ধিঃ।[৪৯]

কার্যের অন্বেষণকে বিরোধ বলে।

বিরোধঃ কার্য্যমার্গণম্।[৫০]

কর্তব্য কার্যের উপন্যাস হল গ্রথন।

উপন্যাসস্তু কার্য্যাণাং গ্রথনম্।[৫১]

অনুভূত বিষয়ের কথনকে নির্ণয় বলা হয়।

নির্ণযঃ পুনঃ ।

অনুভূতার্থকথনম্।।[৫২]

নিন্দাপ্রকাশজনিত বাক্যের নাম পরিভাষণ।

বদন্তি পরিভাষণম্।

পরিবাদকৃতং বাক্যম্।।[৫৩]

লব্ধ বিষয়ের দ্বারা শোকাদির উপশম হলে কৃতি নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়।

লব্ধার্থশমনং কৃতিঃ।।[৫৪]

শুশ্রূষা প্রভৃতিকে প্রসাদ বলা হয়।

শুশ্রূষাদিঃ প্রসাদঃ স্যাত্।।[৫৫]

বাঞ্ছিত বস্তুর সমাগমকে আনন্দ বলা হয়।

আনন্দো বাঞ্ছিতাগমঃ।।[৫৬]

দুঃখের অপগমনকে সময় বলা হয়।

সময়ো দুঃখনির্যাণম্।।[৫৭]

অদ্ভুত বস্তুর উপলব্ধিকে উপগূহন বলে।

তদ্ভবেদুপগূহনম্।

যত্ স্যাদদ্ভুতসংপ্রাপ্তিঃ।।[৫৮]

সামদানাদিকে ভাষণ বলে।

সামদানাদি ভাষণম্।।[৫৯]

পূর্বোক্তবিষয়ের স্মরণকে পূর্ববাক্য বলা হয়।

পূর্ববাক্যং তু বিজ্ঞেযং যথোক্তার্থোপদর্শনম্।।[৬০]

বরদানের প্রাপ্তিকে কাব্যসংহার বলে।

বরপ্রদানসংপ্রাপ্তিঃ কাব্যসংহার ইষ্যতে।[৬১]

রাজা ও দেশাদির শান্তিকে প্রশস্তি বলে।

নৃপদেশাদিশান্তিস্তু প্রশস্তিরভিধীযতে।[৬২]

এই চোদ্দটি নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের মধ্যে সবকটি আলোচ্য প্রহসনে দেখা যায় না। শুধুমাত্র পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ ও আনন্দ নামক সন্ধ্যঙ্গ এই প্রহসনে দেখা যায়। আলোচ্য প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কে অসজ্জনমিশ্র বিদূষকের কাছে যেভাবে মূলনাশক নামক নাপিতের পরিচয় দিয়েছে তা পরিভাষণের বিষয় হয়েছে। আটদিন ধরে কেউ বিবাদের নিষ্পত্তি করতে না আসায় অসজ্জনমিশ্র দুঃখ প্রকাশ করছিল। ঠিক তারপরই দুজন বাদী ন্যায়বিচারের জন্য এসে উপস্থিত হওযায় অসজ্জনমিশ্রের লব্ধ বিষয়ের দ্বারা শোকাদির উপশম হয়। তাই এই বিষয়টি কৃতি নামক সন্ধ্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। প্রহসনটির শেষের দিকে দেখা যায় বিদূষক অসজ্জনমিশ্রের হাতপায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তার শুশ্রূষা করছে। এইভাবে এখানে প্রসাদ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। মূলনাশক নামক নাপিতের বাঞ্ছিত বিষয় হল তার পারিতোষিক। সে যখন অসজ্জনমিশ্রের নিকট তার বাঞ্ছিত গঞ্জাকিণী পেল তখন তা আনন্দ নামক সন্ধ্যঙ্গের বিষয় হয়েছে।

দৃশ্যকাব্যে তেরোটি বীথ্যঙ্গ থাকে। সেগুলি হল – উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎপ্রলাপ, ব্যাহার, মৃদব বা মার্দব।[৬৩] যেখানে নাটকীয় পাত্র সূত্রধার প্রযুক্ত অর্থ গ্রহণ না করে নিজ অভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ করে এবং সেইভাবে বাক্যপ্রয়োগ করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করে তাকে উদ্‌ঘাত্যক শ্রেণীর বীথ্যঙ্গ বলে।

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতযে নরাঃ।

যোজযন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে।।[৬৪]

যেখানে একই বিষয়ের সাদৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে উপমানরূপে পাত্রপ্রবেশ উপস্থাপিত হয় সেখানে অবলগিত হয়।

যত্রৈকশ্চ সমাবেশাত্ কার্য্যমন্যত্ প্রসাধ্যতে।

প্রযোগে খলু তজ্জ্ঞেযং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ।।[৬৫]

পরস্পরের উদ্দেশ্যে মিথ্যা, অলীক হাস্যজনক কথোপকথনকে প্রপঞ্চ বলা হয়।

মিথো বাক্যমসদ্ভূতং প্রপঞ্চো হাস্যকৃন্মতঃ।[৬৬]

শ্রুত শব্দটি একপ্রকার হলেও শ্রোতা যদি তার থেকে বহুপ্রকার অর্থের কল্পনা করে থাকেন তাহলে তাকে ত্রিগত বলা হয়।

ত্রিগতং স্যাদনেকার্থযোজনং শ্রুতি-সাম্যতঃ।।[৬৭]

আপাতত প্রিয় বলে মনে হলেও পরিণামে অপ্রিয় এইরূপ বাক্যের দ্বারা কাউকে প্রলুব্ধ করে ছলনা করাকে ছল নামক বীথ্যঙ্গ বলে।

প্রিযাভৈরপ্রিযৈর্বাক্যৈর্বিলোভ্যচ্ছলনাচ্ছলম্।।[৬৮]

দুই বা তিন প্রত্যুক্তি থেকে উদ্ভূত হাস্যসম্বন্ধকে বাক্‌কেলি নামক বীথ্যঙ্গ বলে।

বাক্‌কেলির্হাস্যসংবন্ধো দ্বিত্রিপ্রত্যুক্তিতো ভবেত্।।[৬৯]

পরস্পর স্পর্দ্ধাসূচক বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকে অধিবল নামক বীথ্যঙ্গ বলা হয়।

অন্যোন্যবাক্যাধিক্যোক্তিঃ স্পর্দ্ধযাধিবলং মতম্।[৭০]

প্রকৃতবিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ভিন্নার্থবোধক সত্বর উচ্চারিত বাক্যের নাম গণ্ড।

গণ্ডং প্রস্তুতসংবন্ধি ভিন্নার্থং সত্বরং বচঃ।।[৭১]

আপন অভিপ্রায়বোধক উক্তির ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করাকে অবস্যন্দিত বলা হয়।

ব্যাখ্যানং স্বরসোক্তস্যান্যথাবস্যন্দিতং ভবেত্।।[৭২]

হাস্যযুক্ত প্রহেলিকার নাম নালিকা। প্রকাশিত বাক্যকে পুনরায় হেঁয়ালির মতো করে বলাই হল প্রহেলিকা।

প্রহেলিকৈব হাস্যেন যুক্তা ভবতি নালিকা।।[৭৩]

যে বাক্য অসম্বন্ধ, যে উত্তর অসম্বন্ধ এবং গ্রহণ না করলেও মূর্খের নিকট হিতকর বাক্য অসৎপ্রলাপ নামে প্রসিদ্ধ বীথ্যঙ্গ।

অসত্প্রলাপো যদ্বাক্যমসংবদ্ধং তথোত্তরম্।

অগৃহ্নতো'পি মূর্খস্য পুরো যচ্চ হিতং বচঃ।।[৭৪]

যেখানে অপরের জন্য হাস্যক্ষোভকর বাক্য প্রযুক্ত হয়, সেখানে ব্যাহার নামক বীথ্যঙ্গ হয়।

ব্যাহারো যত্ পরস্যার্থে হাস্যক্ষোভকরং বচঃ।।[৭৫]

যেখানে গুণাবলী দোষরূপে এবং দোষাবলী গুণরূপে প্রতিভাত হয়, সেখানে মৃদব বা মার্দব নামক বীথ্যঙ্গ হয়।

দোষা গুণা গুণা দোষা যত্র স্যুর্মৃদবং হি তত্।।[৭৬]

সবকটি বীথ্যঙ্গ আলোচ্য প্রহসনে দেখা যায় না। শুধুমাত্র উদ্‌ঘাত্যক, প্রপঞ্চ, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল ও অবস্যন্দিত নামক বীথ্যঙ্গগুলি এই প্রহসনে দেখা যায়। আলোচ্য প্রহসনের শুরুতে সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পাত্র প্রবেশের সময় বিশ্বনগর মধুসূদনের কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন। এখানে উদ্‌ঘাত্যক শ্রেণীর বীথ্যঙ্গ হয়েছে। অনঙ্গসেনার উপর কার আধিপত্য বেশি এই নিয়ে যখন বিশ্বনগর ও তার শিষ্যের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গেল তখন স্নাতক বিশ্বনগরকে বলে যে অনঙ্গসেনা স্নাতকের সঙ্গে সম্পর্ক হেতু তার পুত্রবধূ, তাই অনঙ্গসেনাকে পাবার আশা যেন বিশ্বনগর ত্যাগ করে। আবার বিশ্বনগর এর উত্তরে বলে যে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে স্নাতকের গুরুপত্নী ও মাতৃতুল্যা হল অনঙ্গসেনা, অতএব সে যেন অনঙ্গসেনাকে ভুলে যায়। এইভাবে এখানে পরস্পরের উদ্দেশ্যে অলীক হাস্যজনক কথোপকথনের জন্য প্রপঞ্চ নামক বীথ্যঙ্গ হয়েছে। প্রহসনের শেষের দিকে যখন অনঙ্গসেনা মূলনাশক নামক নাপিতকে বলে যে সে যেন তার প্রাপ্য টাকা অসজ্জনমিশ্রের থেকে নিয়ে নেয়, তখন অসজ্জনমিশ্রের কাছে ব্যাপারটা প্রিয় বলে মনে হলেও তা পরিণামে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। মূলনাশকের দ্বারা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে কষ্ট অনুভব করে। এইভাবে বিষয়টি যেন কিছুটা হলেও ছলের বিষয় হয়েছে। প্রহসনের প্রথম অঙ্কে মৃতাঙ্গার নামক ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা পাওয়া বা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে যে কথোপকথন তা বাক্‌কেলির বিষয় হয়েছে। অনঙ্গসেনাকে পাবার ব্যাপারে বিশ্বনগর ও তার শিষ্যের যে পারস্পরিক কলহ তা অধিবল নামক বীথ্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের নিজেরই অনঙ্গসেনাকে পাবার ইচ্ছে হয়, তাই সে নিজের অভিপ্রায়বোধক উক্তিকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে মিশ্রকে বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীকে নির্ধন, স্নাতককে স্বেচ্ছাচারী বলে ওঠে। এখানে অবস্যন্দিত নামক বীথ্যঙ্গ হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রহসনের প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্য আলোচ্য প্রহসনে মিলে গেলেও সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ এবং বীথ্যঙ্গের বিভাগগুলির সবকটি এখানে নেই। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের রচিত দৃশ্যকাব্যকে প্রহসন বলেছেন। সুতরাং এই কাব্যকে প্রহসন বলতে আর বাধা থাকার কথা নয়।

আলোচ্য প্রহসনটিতে যেমন বীথ্যঙ্গের দ্বারা মিশ্রিত অনেক ধূর্তচরিত্রও আছে তেমনি বেশ্যা চরিত্র যেমন আছে। তাই এই প্রহসনটিকে সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন বলা যায়।

প্রাচীন প্রহসনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মহেন্দ্রবিক্রমবর্মার লেখা *মত্তবিলাস* নামক প্রহসন। পল্লব রাজবংশের রাজা সিংহবিষ্ণুবর্মার পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমবর্মা একাধারে কবি, শিল্পী, যোদ্ধা ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি অনেক কাব্য রচনা করলেও *মত্তবিলাস* নামক প্রহসন তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। *মত্তবিলাস* হাস্যরসযুক্ত এক অঙ্কের প্রহসন। এই প্রহসনে তিনি ধার্মিকদের বিশেষ করে কাপালিক, পাশুপত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমালোচনা করেছেন। এই প্রহসনের মুখ্য চরিত্র হল সত্যসোম নামক কাপালিক, গণিকা দেবসোমা, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন, বভ্রুকল্প নামক পাশুপত, উন্মত্তক নামক এক উন্মাদ। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশনার মাধ্যমে তিনি সমাজের তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিদের তুলে ধরেছেন যারা নিজশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম করে নিজেদের দূষিত করেছে। বিন্দুমাত্র অনুশোচনা না করেই এরা সাধারণ নিয়মনীতিকেও অবহেলা করে। সত্যসোম নামক কাপালিক নিজেকে শৈব বলে পরিচয় দিলেও সে শৈব ধর্মের নিয়মনীতিগুলিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। সে নারী এবং সুরার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত, অন্য সকল ধার্মিক সম্প্রদায়কে

সে অবজ্ঞার চোখে দেখে। আবার নাগসেন নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে এই প্রহসনে দেখতে পাওয়া যায় যে সুরাপান ও নারীকে ভোগ করতে চায় কিন্তু নিজের ধর্মে সেগুলি নিষিদ্ধ থাকায় নিজেকে অনেক কষ্টে আটকে রাখে। দুই ধর্মের মধ্যে মতবিরোধ খুব ভালোভাবে এই প্রহসনে দেখানো হয়েছে। বভ্রুকল্প নামক পাশুপত বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও সে নিরপেক্ষ বিচার না করে নিজেই নিজের সাথে হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য একপক্ষের হয়েই কথা বলে চলে। শেষে বিবাদের মীমাংসা না করতে পেরে বিচারকের কাছে যেতে বলে। তখনই কথা ওঠে যে বিচারক নিরপেক্ষ বিচার করে না। যার ধনসম্পত্তি বেশি সে বিচারককে ধনের ভাগ দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেয়। এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিচারকের চরিত্র সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ওঠে। আবার অন্যদিকে প্রহসনের একমাত্র নারী চরিত্রের কথার অসঙ্গতি ও বিশ্বাসহীনতাকে কবি সমালোচনা করেছেন। পরে কাপালিকের ঈপ্সিতবস্তুলাভের মধ্য দিয়ে প্রহসনটি সমাপ্ত হয়।[৭৭]

প্রাচীন প্রহসনগুলির মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন হল *ভগবদজ্জুকীয়,* যা *ভগবদজ্জুকা* নামেও প্রসিদ্ধ। এই প্রহসনের রচনাকার কে সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে পল্লব রাজবংশের রাজা সিংহবিষ্ণুবর্মার পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমবর্মা এই প্রহসনটি লেখেন। মহেন্দ্রবিক্রমবর্মার আরেকটি জনপ্রিয় প্রহসন হল *মত্তবিলাসপ্রহসন। ভগবদজ্জুকীয়* প্রহসনের প্রস্তাবনা অংশে রচনাকারের নামের উল্লেখ না থাকলেও *মত্তবিলাস* প্রহসনের প্রস্তাবনা অংশে রচনাকারের নাম আছে। এর থেকে অনেকে অনুমান করেন যে প্রহসনটি মহেন্দ্রবিক্রমবর্মার নামে প্রচলিত হলেও এটি তাঁর রচনা নয়। এই প্রহসনের মুখ্য চরিত্রগুলি হল পরিব্রাজক, তাঁর শিষ্য শাণ্ডিল্য, গণিকা বসন্তসেনা, যমের দূত, বৈদ্য, গণিকার প্রেমিক রামিলক, গণিকার মাতা, গণিকার দুই

চেটী। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। পরিব্রাজক যোগশাস্ত্রে খুবই নিপুণ। সে তার শিষ্যকে শিক্ষাদান করতে চায় কিন্তু তার শিষ্য শাণ্ডিল্য সারাক্ষণ খাবার খাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করে। সে ব্রাহ্মণ হলেও সবসময় ক্ষুধার্ত। এই শাণ্ডিল্য চরিত্রটি অনেকটা নাটকের বিদূষকের চরিত্রের মতো। এক উদ্যানে গিয়ে বসন্তসেনা নামে এক গণিকাকে দেখে তার মধুর সঙ্গীত শুনে শাণ্ডিল্যের খুব ভালো লাগে। কিন্তু হঠাৎ গণিকা সাপের কামড়ে মারা যায়। আসলে যমরাজের দূত ভুল করে বসন্তসেনা নামে অন্য কারোর জায়গায় গণিকা বসন্তসেনার আত্মা নিয়ে চলে যায়। তখন শাণ্ডিল্য গণিকা বসন্তসেনাকে মৃত দেখে বিলাপ করতে থাকে। শিষ্যকে এই সবের থেকে নিরত করতে না পেরে তাকে শিক্ষা দেবার জন্য পরিব্রাজক তার যোগশিক্ষার মাধ্যমে নিজের দেহ ত্যাগ করে গণিকার দেহে প্রবেশ করে এবং তারপর হঠাৎ গণিকা বেঁচে ওঠে। গণিকার ভিতরে থাকা পরিব্রাজকের আত্মা সেই অবস্থাতেই শিষ্যকে পাঠদান করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত গণিকার মাতা, গণিকার প্রেমিক, দুজন চেটী, চিকিৎসা করতে আসা বৈদ্য সকলেই অবাক হয়ে যায়। ইতিমধ্যে যমপ্রেরিত দূত নিজের ভূল বুঝতে পেরে গণিকার আত্মা ফেরত দিতে এসে দেখে গণিকার শরীরে পরিব্রাজকের আত্মা প্রবেশ করেছে এবং পাশে পরিব্রাজকের আত্মাশূন্য দেহ পরে আছে। তা দেখে যমদূত পরিব্রাজকের দেহে গণিকার আত্মা ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। ফলে পরিব্রাজক গণিকার আচরণ করতে শুরু করে। গণিকা পরিব্রাজকের আচরণ ও পরিব্রাজক গণিকার আচরণের মধ্য দিয়ে এখানে চূড়ান্ত হাস্যরস বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলে কিছুক্ষণ পরে যমদূত এসে সত্য ঘটনা সবাইকে জানায়। তখন যমদূতের অনুরোধে পরিব্রাজকের আত্মা নিজের শরীরে

প্রবেশ করলে যমরাজ গণিকার আত্মাকেও তার নিজের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এইভাবে সব সমস্যার সমাধানে প্রহসনটি সমাপ্ত হয়।[৭৮]

মত্তবিলাস ও *ভগবদজ্জুকীয়* এই দুটি প্রহসনের মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি *ধূর্তসমাগম* প্রহসনটির সঙ্গেও এদের মিল আছে, কিছু ক্ষেত্রে আবার অমিলও বর্তমান। তিনটি প্রহসনই যে সময়ে লেখা হয়েছিল সেই সময়ে এগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। *মত্তবিলাস* প্রহসনে আমরা এক মত্ত কাপালিকের কথা পাই যার ধারণা ছিল তার ভিক্ষার পাত্র চুরি করেছে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। আসলে সেই পাত্র চুরি করেছিল এক রাস্তার কুকুর। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু আবার বৌদ্ধদের নিয়মনীতিগুলিকে মন থেকে মেনে নিতে পারত না। আবার *ভগবদজ্জুকীয়* প্রহসনে শাণ্ডিল্য নামক শিষ্যের কথা জানতে পারি যে বারবার বৌদ্ধদের নিয়ম-নীতিগুলির কঠোর সমালোচনা করেছে। *ধূর্তসমাগম* প্রহসনেও আমরা এক সন্ন্যাসীর কথা জানতে পারি যে তার গণিকাপ্রীতির জন্য সমাজের কাছে নিন্দনীয় ছিল। সামাজিক নিয়মগুলিকে সে মেনে চলত না। সুতরাং তিনটি প্রহসনেই দেখা যাচ্ছে যে সাধু শ্রেণীর ব্যক্তিরা আসলে ভণ্ড প্রকৃতির ছিল। তারা নিয়মনীতি মেনে চলত না। নিয়ম মানার ব্যাপারে তাদের শিথিলতা লক্ষ করা যায়। তারা নিজেদের স্ব স্ব ধর্মপালনে তৎপর দেখাতে চাইলেও তারা আসলে ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। তিনটি প্রহসনেই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবের স্তুতি করা হয়েছে। *মত্তবিলাস* প্রহসনে কপালীর (শিবের একটি নাম) স্তুতি করা হয়েছে। আবার *ভগবদজ্জুকীয* প্রহসনে রুদ্রের (শিবের একটি নাম) স্তুতি করা হয়েছে। *ধূর্তসমাগম* প্রহসনেও পঞ্চবক্ত্রের (শিবের আরেক নাম) স্তুতি করা হয়েছে। *মত্তবিলাস* ও *ভগবদজ্জুকীয* প্রহসনদুটি ভাসের রচনারীতির সঙ্গে তুলনীয়। ভাসের নাটকগুলির মতো এই দুটি প্রহসনে নান্দী নেই। যদিও এই নান্দী রূপকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু *ধূর্তসমাগম*

প্রহসনে নান্দীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। *মত্তবিলাস* ও *ভগবদজ্জুকীয়* প্রহসন দুটিতে খাওয়ার দৃশ্যের বর্ণনা আছে, যা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রথাবিরুদ্ধ। আবার *ভগবদজ্জুকীয়* প্রহসনটিতে মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা আছে, যা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রথাবিরুদ্ধ। কিন্তু *ধূর্তসমাগম* প্রহসনটিতে অনেক খাবারের নামের কথা উল্লিখিত হলেও খাবার খাওয়ার দৃশ্যের বর্ণনা নেই, আবার মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনাও নেই। *মত্তবিলাস* প্রহসন ও *ধূর্তসমাগম* প্রহসনের প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনের বর্ণনা থাকলেও *ভগবদজ্জুকীয়* প্রহসনে সূত্রধার ও বিদূষকের কথোপকথন বর্ণিত আছে। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় যে তিনটি প্রহসনের মধ্যে যেমন কিছু মিল আছে, তেমনি কিছু অমিলও বর্তমান। তবে এককথায় বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি প্রহসন প্রত্যেকটির থেকে আলাদা এবং স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী

১। ধনঞ্জয়, *দশরূপক,* তৃতীয় প্রকাশ, কারিকা(কা.) ৫৪।

২। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ২৬৮।

৩। ধনঞ্জয়, *দশরূপক,* তৃতীয় প্রকাশ, কা. ৫৫-৫৬।

৪। ভরত, *নাট্যশাস্ত্র,* বিংশ অধ্যায়, কা. ১০৩-১০৪।

৫। সাগরনন্দী, *নাটকলক্ষণরত্নকোশ,* পৃ.২৯৬।

৬। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ২৬৬।

৭। ধনঞ্জয়, *দশরূপক,* তৃতীয় প্রকাশ, কা. ৫৪-৫৫।

৮। ভরত, *নাট্যশাস্ত্র,* বিংশ অধ্যায়, কা. ১০৫-১০৬।

৯। সাগরনন্দী, *নাটকলক্ষণরত্নকোশ,* পৃ.২৯৬।

১০। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ২৬৬।

১১। ধনঞ্জয়, *দশরূপক,* তৃতীয় প্রকাশ, কা. ৫৬।

১২। বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কা. ৫১-৫২।

১৩। *তদেব,* কা. ২৬৫।

১৪। *তদেব,* কা. ১৩২।

১৫। *তদেব,* কা. ২৬৫।

১৬। *তদেব,* কা. ২৬৪।

১৭। *তদেব,* কা. ৬৫।

১৮। *তদেব,* কা. ৭১।

১৯। *তদেব,* কা. ৭৬।

২০। *তদেব,* কা. ৬৯।

২১। *তদেব,* কা. ৭৩।

২২। *তদেব,* কা. ৮০।

২৩। *তদেব,* কা. ২১২-২১৩।

২৪। *তদেব,* কা. ২১৪।

২৫। *তদেব,* কা. ২১৫।

২৬। *তদেব,* কা. ২১৬।

২৭। *তদেব,* কা. ২১৭।

২৮। *তদেব,* কা. ২১৮।

২৯। *তদেব,* কা. ২১৮।

৩০। *তদেব,* কা. ২১৯।

৩১। *তদেব,* কা. ২২০।

৩২। *তদেব,* কা. ২২১।

৩৩। *তদেব,* কা. ২২১-২২২।

৩৪। *তদেব,* কা. ২৬৪।

৩৫। *তদেব,* কা. ৮১-৮২।

৩৬। *তদেব,* কা. ৮৩।

৩৭। *তদেব,* কা. ৮৩।

৩৮। *তদেব,* কা. ৮৪।

৩৯। *তদেব,* কা. ৮৪।

৪০। *তদেব,* কা. ৮৪।

৪১। *তদেব,* কা. ৮৪।

৪২। *তদেব,* কা. ৮৫।

৪৩। *তদেব,* কা. ৮৫।

৪৪। *তদেব,* কা. ৮৬।

৪৫। *তদেব,* কা. ৮৬।

৪৬। *তদেব,* কা. ৮৬।

৪৭। *তদেব,* কা. ৮৭।

৪৮। *তদেব,* কা. ১০৮-১০৯।

৪৯। *তদেব,* কা. ১১০।

৫০। *তদেব,* কা. ১১০।

৫১। *তদেব,* কা. ১১০।

৫২। *তদেব,* কা. ১১০।

৫৩। *তদেব,* কা. ১১১।

৫৪। *তদেব,* কা. ১১১।

৫৫। *তদেব,* কা. ১১২।

৫৬। *তদেব,* কা. ১১২।

৫৭। *তদেব,* কা. ১১২।

৫৮। *তদেব,* কা. ১১২।

৫৯। *তদেব,* কা. ১১৩।

৬০। *তদেব,* কা. ১১৩।

৬১। *তদেব,* কা. ১১৪।

৬২। *তদেব,* কা. ১১৪।

৬৩। *তদেব,* কা. ২৫৫-২৫৬।

৬৪। *তদেব,* কা. ৩৩।

৬৫। *তদেব,* কা. ৩৮।

৬৬। *তদেব,* কা. ২৫৭।

৬৭। *তদেব,* কা. ২৫৭।

৬৮। *তদেব,* কা. ২৫৮।

৬৯। *তদেব,* কা. ২৫৯।

৭০। *তদেব,* কা. ২৬০।

৭১। *তদেব,* কা. ২৬০।

৭২। *তদেব,* কা. ২৬১।

৭৩। *তদেব* কা. ২৬১।

৭৪। *তদেব,* কা. ২৬২।

৭৫। *তদেব,* কা. ২৬৩।

৭৬। *তদেব,* কা. ২৬৩।

৭৭। কে.কে.মালাঠি দেবী, *প্রহসনস্ ইন সংস্কৃত লিটারেচার অ্যান্ড কেরালা স্টেজ,* পৃ.৪৫।

৭৮। *তদেব,* পৃ.৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক প্রেক্ষাপট

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছরের কাছাকাছি দক্ষিণভারতে যে সব যুদ্ধ ও নৈরাজ্য চলেছিল তার পরিণামে শুধুমাত্র যে রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়েছিল তা নয়, সামাজিক দিক দিয়েও পরিবর্তন হয়েছিল।

Thus, for about two hundred years – from the beginning of the thirteenth century to the end of fourteenth century – south India experienced successive wars and anarchy that not only devastated the region but also accelerated the social change that had started in the twelfth century, transforming the south Indian social formation from the old to the new.[১]

ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে জমি দান করা হত। এই জমিদানের ওপরেই সমাজের উন্নতি নির্ভরশীল ছিল। সেই জমির ওপর খাজনা নেওয়ার প্রচলন ছিল। অর্থনীতির দিক থেকে এর গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সবাইকেই জমি দান করা হত। ব্রাহ্মণদের জমিদানকে বলা হত ব্রহ্মদেয় এবং অব্রাহ্মণদের জমিদানকে বলা হত অব্রহ্মদেয়। মন্দিরের কাজকর্ম নির্বাহণ করার জন্য মন্দিরের প্রধানকে রাজারা কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য করতেন। কোনও কোনও সময় আবার খাজনাও মকুব করে দেওয়া হত।[২] সেই সময় সমাজে বর্ণ-জাতির ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, অসাম্য ছিল। অস্পৃশ্যতা সমাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল।[৩] ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে আমরা অনেক অভিলেখ পাই যার থেকে আমরা জানতে পারি সে যুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল। ক্রমে চোল বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও খর্ব হতে

থাকে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বণিক ও কারিগরশ্রেণীর ব্যবসা বৃদ্ধির ফলে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। অপরদিকে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সমতলে নেমে এসে ব্যবসা করার ফলে তাদেরও জনপ্রিয়তা ক্রমে বাড়তে থাকে। এই শ্রেণীভুক্ত মানুষরা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেল।[৪] ক্রমে ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করে নিল সমাজের এই সব নিচু গোষ্ঠী যারা নিজেদের আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ফলে সমাজে উঁচু স্থান করে নিয়েছিল। এরপর চোলবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তথাকথিত নিম্নবর্গের গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার সুযোগে পাণ্ড্যবংশ তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে আবার ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বিস্তার করে।[৫] এই সময়ে অনেক মঠ ও ধর্মশালা স্থাপিত হয়েছিল।

রূপককে জীবনদর্পণ বলা হয়, তাই সব রূপকে তৎকালীন রীতি-নীতির, সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু যে সময়ের সেই সময়ের জীবনধারাই প্রতিফলিত হয় রূপকে। রূপককারকে তাঁর বিষয়বস্তুর সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় অবস্থার প্রতি অবধান দিতে হয় বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একবিংশ শতাব্দীতে যদি পাঁচশ বছর আগের বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য লেখা হয় তাহলে সেই কাব্যে সেই সময়ের সমাজের ছবি ফুটে উঠবে, বর্তমানকালের সমাজের ছবি ফুটে উঠবে না।

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত *ধূর্তসমাগম* নামক মধ্যযুগীয় প্রহসনটিতে সমাজব্যবস্থার যে দিকটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল ধূর্তশ্রেণীর চরিত্রের বাহুল্য।

সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যখন কোন অপকর্মে লিপ্ত হন, তখন প্রহসন জাতীয় কাব্য তৈরি হয়। আলোচ্য প্রহসনেও সাধারণতঃ নিন্দিত, ধূর্তশ্রেণীর চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। সন্ন্যাসীরা সাধারণভাবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হলেও আলোচ্য প্রহসনে চরিত্রগত দোষের কারণে জনসাধারণের কাছে তারা নিন্দার পাত্র হয়ে উঠেছিল। পরিধানের কাষায় বস্ত্র স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, দণ্ডকুণ্ডিকহস্ত ধূর্তের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে এইরকম কোন এক আগন্তুক ব্যক্তিকে দেখিয়ে নটী সূত্রধারকে তার পরিচয় জানতে চায়। এর উত্তরে সূত্রধার বলেন যে জনসাধারণের মুখ থেকে তিনি শুনেছেন অশ্বের মতো (যৌন)ক্রিয়াযুক্ত, আচারধর্মরহিত, গণিকাবিলাসী, ঊর্ধ্বে দীর্ঘতিলকযুক্ত, কমণ্ডলুদণ্ডহস্ত ব্যক্তি হলেন বিশ্বনগর, যার দর্শন দূর থেকে পরিহার করা উচিত। এখানে সূত্রধার ও নটীর কথোপকথন থেকে আমরা এই বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসীর চরিত্র বুঝতে পারি। সে ধূর্ত, আচারধর্মরহিত, গণিকাবিলাসী হওয়ার জন্য সকলে তার দর্শন পরিহার করতে চায়। এইরকম লোকেরা গণিকার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তির জন্য নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম থেকেও বিচ্যুত হতেও পিছপা হত না। এই সন্ন্যাসী যেদিন প্রাতে সুরতপ্রিয়া নামে এক মাসোপবাসিনীর প্রেমে পড়ে সেইদিনই আবার তার শিষ্যের প্রেমিকা সুন্দরী অনঙ্গসেনা নামক গণিকাকে দেখে তাকে পাবার জন্য নিজ শিষ্যের সাথে কলহে লিপ্ত হয়। আবার ঘটনাচক্রে অনঙ্গসেনাকে লাভ করতে না পেরে সেই সুরতপ্রিয়ার কাছেই ফিরে যায়। এইভাবে তৎকালীন সমাজে নিন্দনীয় সন্ন্যাসীদের কথা আমরা জানতে পারি।

সেযুগে পুরুষেরা অতি সহজেই গণিকার প্রেমে পড়লেও তারা জানত যে গণিকাপ্রীতি খুব একটা সম্মাননীয় নয়। তাই স্নাতক দুরাচার গণিকা অনঙ্গসেনার ওপর নিজের আসক্তির কথা সকলের কাছে প্রকাশ করা অনুচিত বলে মনে করে। তাছাড়া

বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসী ও তার শিষ্য দুরাচার একে অপরের কাছে নিজেদের প্রেমের কথা স্বীকার করে। পরবর্তীকালে গণিকাকে কেন্দ্র করে তাদের কলহের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যেরকম সম্ভ্রমপূর্ণ হওয়া উচিত সেরকম দেখানো হয় নি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এতটা খোলামেলা সম্পর্ক পরবর্তীকালে দেখা যায় না।

সন্ন্যাসীর বেশধারী ব্যক্তিকে যে সকলে সম্মান করত না তা আমরা এই প্রহসনে দেখতে পাই। মৃতাঙ্গার ঠক্কুর নামক এক কৃপণ চরিত্রকে আলোচ্য প্রহসনে দেখতে পাওয়া যায় যে সর্বদা নিজের ধনসম্পত্তি ব্যয় হয়ে যাবার ভয়ে সবরকম ভোগসুখ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। বিস্তৃত ধনসম্পত্তির চিন্তায় তার নিদ্রা অপগত। এইরকম মৃতাঙ্গার ঠক্কুরের গৃহে মধ্যাহ্নে যখন সন্ন্যাসী তার শিষ্যের সঙ্গে ভিক্ষান্ন পাবার জন্য প্রবেশ করে তখন সে নানা উপায়ে তাদের ভিক্ষা না দেবার চেষ্টা করে। তার মতে দানের অভ্যাস থাকলে কুবেরও দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণ দান করা সহজ কিন্তু অর্থীকে ধনদান করা একেবারেই উচিত নয়। এর থেকে বোঝা যায় সে যথেষ্ট কৃপণ ছিল। ভিক্ষান্ন পাবার জন্য সন্ন্যাসীর উপস্থিতি তার কাছে ধূমকেতু তুল্য। তাই জননাশৌচ হওয়ার কথা বলে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে গৃহের উত্তরদিকে অবস্থিত সুরতপ্রিয়া নামে মাসোপবাসিনীর গৃহে যাবার কথা সন্ন্যাসীকে বলে। সন্ন্যাসীরাও যে এই ধরনের ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত ছিল তাও বোঝা যায়। সেইযুগে সন্ন্যাসীরা এতটাই দরিদ্র ছিল যে তারা নিজেরা অপমানিত হয়েও সেই অপমানকে খুব একটা গ্রাহ্য করত না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অপমান সহ্য করেও ভিক্ষান্ন জোগাড় করা। তাই মৃতাঙ্গার ঠক্কুর কোনোমতেই ভিক্ষা দিতে চায় না একথা বিশ্বনগর বুঝতে পারলেও সে ভিক্ষা পাবার চেষ্টা করতেই থাকে। মৃতাঙ্গারের ব্যবহার ছলনাপূর্বক বুঝতে পেরেও ভিক্ষা চাইতেই থাকে। এই মৃতাঙ্গার ঠক্কুর নামক চরিত্রটি তৎকালীন সমাজের কৃপণ অথচ ধনশালী

ব্যক্তিদের প্রতিনিধিস্বরূপ যার জন্য সন্ন্যাসীরা তার বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলতেও পারে না। এইরকম কৃপণ অথচ ধনশালী ব্যক্তি তৎকালীন সমাজে দেখা যেত বলে এই প্রহসনে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

স্নাতক দুরাচার সাধারণতঃ প্রাকৃতভাষায় কথা বললেও ভিক্ষা না দেবার জন্য যখন মৃতাঙ্গার ঠক্কুরের ওপর ক্রুদ্ধ হয় তখন হঠাৎ সংস্কৃতভাষায় কথা বলে ওঠে। বিশ্বনগরের কাছে সুরতপ্রিয়া সুন্দরী, চিত্তাকর্ষক হলেও স্নাতক দুরাচারের কাছে সুরতপ্রিয়া কোনোদিক দিয়েই সুন্দরী ছিল না। তাই যখন সে সুরতপ্রিয়ার কুরূপ বর্ণনা করে তখন সে সংস্কৃতভাষায় কথা বলে। বাকী সময় সে প্রাকৃতে কথা বলে। এর থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে শিষ্য শ্রেণীর চরিত্ররা সংস্কৃতভাষা জানলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাদের সংস্কৃতে কথা বলার অধিকার ছিল না। তাদের কথা বলতে হত প্রাকৃতে। তৎকালীন সমাজে সন্ন্যাসী ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের শুধুমাত্র সংস্কৃতে কথা বলার অধিকার ছিল।

সুরতপ্রিয়া নামে এক মাসোপবাসিনীকে এই প্রহসনে দেখতে পাওয়া যায়, যার ধর্ম ও মোক্ষ অভীষ্ট নয়। এই মাসোপবাসিনী সুরতপ্রিয়া আসলে গণিকা ছিল। মাসোপবাসিনী শব্দের অর্থ যিনি একমাস উপবাস ধারণ করে ব্রত করছেন, কিন্তু ব্যঙ্গার্থে মাসোপবাসিনী বলতে গণিকাকে বোঝানো হয়। যেহেতু এটি প্রহসন তাই মাসোপবাসিনী বলতে এখানে ব্যঙ্গার্থে গণিকাকেই বোঝানো হয়েছে। তার মতে অর্থের দ্বারা সবকিছুই সাধিত হতে পারে আর কাম সকল কলার আশ্রয়। এইরকম সুরতপ্রিয়ার গৃহে যখন সন্ন্যাসী ও তার শিষ্য প্রবেশ করে ভিক্ষান্ন চায় তখন সে সহজেই তাদের বিশ্বাস করে ও ভিক্ষান্ন দিতে সম্মতি জানায়। বিশ্বনগর ভিক্ষান্নস্বরূপ

বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের দাবী করলেও সুরতপ্রিয়া বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে সেই খাদ্যদ্রব্য দান করবে বলে অঙ্গীকার করে। এর থেকে বোঝা যায় যে তৎকালীন সমাজে গণিকাদের আর্থিক অবস্থা আদৌ খারাপ ছিল না। সুরতপ্রিয়া হয়তো তার সন্ন্যাসী অতিথিদের সেবাকে নিজের সামাজিক অবস্থান থেকে মর্যাদার কাজ বলে মনে করেছিল। সন্ন্যাসীরা যে গণিকার তৈরি খাবার খাবেন এটা হয়তো তার কাছে সম্মানের বলে বোধ হয়েছিল।

সুরতপ্রিয়ার গৃহ থেকে চন্দন কাঠ, মুস্তাঘাস, মেথির সঙ্গে রসুন, কুষ্ঠের (ওষধিবিশেষ) নিষ্পেষণজাত গন্ধ পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিশেষ ধরনের গন্ধ গণিকাদের বাসভবনের পরিচায়ক ছিল বলে বোঝা যায়।

বিশ্বনগর নামক সন্ন্যাসী যে সব খাদ্যদ্রব্য সুরতপ্রিয়ার কাছে ভিক্ষা চায় তা থেকে তৎকালীন ভোজনরুচির আভাস পাওয়া যায়। এও বোঝা যায় যে সন্ন্যাসীরা মাংস, মাছ, উত্তেজক পানীয় ইত্যাদি তাদের জন্য নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। খাবার ব্যাপারে তারা কোনও শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলত না। এখানে বিপুল পরিমাণ যেসব খাদ্যদ্রব্যের কথা বলা আছে সেগুলি সাধারণ মানুষদের লোভনীয় খাদ্য ছিল। সেইসব খাদ্য খাওয়ার লোভ সন্ন্যাসীদের থাকায় এই প্রহসনে তৎকালীন সমাজের নিষিদ্ধ খাদ্যলোভী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

অনঙ্গসেনার রূপলাবণ্য দেখেই বিশ্বনগর তার প্রেমে পড়ে যায়। সে ভুলে যায় যে অনঙ্গসেনা তার শিষ্যের প্রিয়তমা আর তার নিজের পছন্দের রমণী সুরতপ্রিয়া। এইভাবে খুব সহজেই এক রমণী থেকে আরেক রমণীতে আকৃষ্ট হওয়া বোধহয় সব

যুগের সমাজে পুরুষদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। তাই এই প্রহসনে পুরুষদের চরিত্রের এই দিকটি ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

স্নাতক দুরাচার তার গুরু বিশ্বনগরের কামুক দৃষ্টি থেকে নিজ প্রিয়তমা অনঙ্গসেনাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গুরুকে সন্ন্যাসীর ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন সন্ন্যাসীর ধর্ম কি হওয়া উচিত তা দুরাচার জানলেও সে নিজে কিন্তু সেই ধর্ম মেনে চলত না। ক্রমে গুরু-শিষ্য গণিকাকে কেন্দ্র করে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে যা মোটেই শোভনীয় নয়।

অনঙ্গসেনা নামক গণিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তার মধ্যে গণিকার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রতারণা নিপুণতা অধিক পরিমাণে বর্তমান। সে নিজেই স্বীকার করে নেয় যে গণিকারা ধনের অধীন হয়। ধন ছাড়া তাদের কাছে কোনও কিছু আশা করা অরণ্যে রোদনের সমান। অনঙ্গসেনা যখন বিশ্বনগরকে প্রত্যাখ্যান করে তখন সে সংস্কৃতে কথা বলে। তৎকালীন সমাজে গণিকাদের সংস্কৃতভাষায় কথা বলার অধিকার না থাকলেও তারা যে সংস্কৃতে কথা বলতে পারত তা আমরা এই প্রহসনে দেখতে পাই।

নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হবার পর সন্ন্যাসী ও স্নাতক দুজনেই অনঙ্গসেনাকে নিজের নিজের বধূ বলে ওঠে। তারা কিন্তু একবারও অনঙ্গসেনার মনের কথা জানতে চায় না। এর থেকে সমাজে নারীজাতির অপ্রাধান্যতা প্রকাশ পায়। নারীরা বিশেষ করে গণিকারা হয়ত নিজেদের ইচ্ছের কথা সহজে প্রকাশ করতে পারত না। *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে বসন্তসেনার মত গণিকার কথা অবশ্য আলাদা।

কলহের সমাধান না হওয়ায় অনঙ্গসেনা কলহের বিচার করতে পটু অসজ্জনমিশ্রের কাছে যাওয়ার কথা বলে। এর থেকে বোঝা যায় সেযুগে জনসাধারণের বিচারসভার ওপর আস্থা ছিল। অপর দিকে দেখা যায় এই বিচারক পদে আসীন অসজ্জনমিশ্রের কাছে ত্রিভুবনের সারবস্তু হল রতি, তার কাছে রতি ছাড়া জীবন বৃথা। আবার তার শিষ্য বিদূষকের কাছে পরের ধন অপহরণ ও পাশাখেলার সুখই হল ত্রিভুবনের সারবস্তু। এই দুই চরিত্র যে কতটা ধূর্ত ও অসৎ তার পরিচয় আমরা প্রহসনের শেষের দিকে পাই। বিচারক নিরপেক্ষ ভাবে বিচার তো করেই না, উল্টে বিবাদের বিষয় অনঙ্গসেনার রূপলাবণ্য দেখে অনঙ্গসেনাকে নিজের প্রিয়া বলে দাবী করে। সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জানায় যে অনঙ্গসেনা পূর্বে স্বপ্নে তার সাথে কেলি করেছে, তাই অনঙ্গসেনার ওপর একমাত্র তার অধিকার। সেই সুযোগে আবার বিদূষক অনঙ্গসেনাকে বলে যে অসজ্জনমিশ্র বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী নির্ধন এবং স্নাতক স্বেচ্ছাচারী, অতএব অনঙ্গসেনা যেন তাকেই স্বীকার করে। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে বিচারসভার ওপর জনসাধারণের আস্থা থাকলেও বিচারকরা মোটেই আস্থার পাত্র ছিল না। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনে তারা মিথ্যার আশ্রয়ও নিত। বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এখানে নাট্যকার আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণেও বিচারসভার চূড়ান্ত অবনতি দেখা যায়। অপরাধীকে শাস্তি না দেবার প্রবণতা, নিরপেক্ষ বিচার না করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

মূলনাশক নামক নাপিতের চরিত্র এই প্রহসনে দেখা যায় যে অনঙ্গসেনার হয়ে বহুবার ক্ষৌরকর্ম করলেও অনঙ্গসেনা তাকে বেতন না দিয়ে প্রতারণা করে। ফলে অনঙ্গসেনাকে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে সে নিজ প্রাপ্য বেতন আদায় করতে চায়। অনঙ্গসেনাও ভয় পেয়ে গিয়ে অসজ্জনমিশ্রের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মূলনাশকের বেতন

ফেরত দেবে বলে জানায়। এর থেকে বোঝা যায় যে সেযুগে জনসাধারণের মধ্যে রাজদণ্ডের ভয় প্রবল ছিল। আর অনঙ্গসেনা প্রৌঢ়া বেশ্যা বলে হয়তো তার উপার্জন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই সে নিজের সঞ্চিত ধনসম্পদ্ ব্যয়ে পরাঙ্মুখ। আবার মূলনাশক নাপিত বারবার প্রতারিত হবার ফলস্বরূপ আগে বেতন নিয়ে তারপর ক্ষৌরকর্ম করার কথা ভাবে। এখানে নাপিতের কূটবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর মূলনাশক যখন অসজ্জনমিশ্রের হাত-পা বেঁধে দিয়ে ক্ষৌরকর্ম করছে তখন বেদনাবশতঃ অসজ্জনমিশ্র অজ্ঞান হয়ে গেলে তার শুশ্রূষা না করে তাকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে মূলনাশক চলে যায়। এখানে মূলনাশক নাপিতের নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। সবশেষে বিদূষক অসজ্জনমিশ্রের জ্ঞান ফিরিয়ে আনে এবং অসজ্জনমিশ্র তখন বুঝতে পারে যে সমগ্র জগত ধূর্তে পরিপূর্ণ হলেও তার শিষ্য বিনীত ও তার অনুগত। এইভাবে প্রহসনটি সমাপ্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলোচ্য *ধূর্তসমাগম* প্রহসনে একজন গণিকাকে কেন্দ্র করে তাকে পাবার জন্য সমাজের প্রায় সব স্তরের চরিত্রের ধূর্ততা দেখানো হয়েছে। প্রহসনের মধ্য দিয়ে যেহেতু সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থা ফুটে ওঠে তাই বলা যেতে পারে যে তৎকালীন সমাজ ধূর্তে পরিপূর্ণ ছিল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। সুযোগ পেলে সবাই সবাইকে ঠকাতেও দ্বিধা করত না। অবশ্য তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রসূত হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে একটু অতিরঞ্জন করতেই হয়। সেইটুকু ছাড় দিলেও সেই সময়ের সমাজের অবক্ষয়ের ছবি কিন্তু এখানে উজ্জ্বল ভাবেই প্রকাশিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী

১। নোবোরু কারাশিমা, *এ কনসাইজ হিস্ট্রি অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়া,* পৃ. ১৭৪।

২। নোবোরু কারাশিমা, *হিস্ট্রি অ্যান্ড্ সোসাইটি অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়া,* পৃ. ৩১।

৩। রণবীর চক্রবর্তী, *দ্য মেডিভ্যাল হিস্ট্রি জার্নাল,* পৃ. ১৫৭।

৪। নোবোরু কারাশিমা, *এ কনসাইজ হিস্ট্রি অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়া,* পৃ. ১৭৮-১৭৯।

৫। *তদেব,* পৃ. ১৮১।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

ধূর্তসমাগম প্রহসনে নাট্যকার যে সাহসসিকতার পরিচয় দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। তিনি কর্ণাট রাজবংশের রাজা হরসিংহের (মতান্তরে রাজা নরসিংহের) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রাজার পৃষ্ঠপোষক হয়ে বিচারব্যবস্থার সমালোচনা করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তিনি তাঁর প্রহসনের মধ্য দিয়ে বিচারব্যবস্থার নিন্দনীয় দিকগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সমাজে জনসাধারণ বিচারের জন্য বিচারসভার দ্বারস্থ হলেও নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য বিচার যে হতো না তা নাট্যকার নিজে অনুভব করেছিলেন। তাই সমাজের এই কুৎসিত দিকটিকে তিনি তাঁর প্রহসনে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিচারসভার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলি কাব্যের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার অর্থ পক্ষান্তরে সমকালীন রাজার ত্রুটিগুলিকে সকলের সামনে নিয়ে আসা। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এই কাজটি করা সহজ ছিল না কিন্তু তাও তিনি আপাত কঠিন কাজটিই করেছিলেন বলেই আমরা *ধূর্তসমাগম* নামক সুন্দর একটা প্রহসন পাই।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যখন সমাজের সার্বিক অধঃপতন ঘটে, বিশেষ করে সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন কোনও অপকর্মে লিপ্ত হন তখনই কোনও না কোনও সৃজনশীল নাট্যকার ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের কুৎসিত দিকগুলিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যখন সমাজের রক্ষকরাই ভক্ষক হয়ে ওঠেন তখন তা দেখে সাধারণ মানুষ অনেকসময় চুপ করে থাকলেও নাট্যকারের

লেখনী কখনও থেমে থাকে না। কখনও কখনও নাট্যকার এই জাতীয় কাব্য লিখতে গিয়ে কাহিনীকে অতিরঞ্জিত করেছেন, যা অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে নাট্যকার যদি কোনও ঘটনাকে সাধারণ ভাবে উপস্থাপিত করেন তাহলে সেই ঘটনা সহজে পাঠকদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু সেই ঘটনাকেই যদি কিছুটা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা যায় তাহলে খুব সহজেই পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে। বাংলা সাহিত্যে, ইংরেজি সাহিত্যে এইরকম অজস্র ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের মধ্যেও আমরা এইরকম ব্যঙ্গ দেখতে পাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক নাটকে খুব স্পষ্ট ভাবে না হলেও বিচার ব্যবস্থার অবনতি দেখানো হয়েছে। শুধুমাত্র লেখনীর মাধ্যমেই যে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তোলা হয়, তা নয়। কোনও সৃজনশীল চিত্রকার রং-তুলির মাধ্যমে চিত্র অঙ্কনের দ্বারা কোনও চরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলিকে তুলে ধরতে পারেন। আবার চলচ্চিত্র, পথনাটক ইত্যাদির মাধ্যমেও নিন্দনীয় চরিত্রগুলিকে ব্যঙ্গ করা হয়। বর্তমান সমাজের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হোয়াটস্ অ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সমানভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সম্ভব হচ্ছে। এইভাবে যুগে যুগে সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষেরা যখন অন্যায় কর্মে লিপ্ত হন তখনই ব্যঙ্গরসাত্মক প্রহসন জাতীয় কাব্যের উৎপত্তি হয়।

উদ্ধৃতিগ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

আচার্য, সীতানাথ এবং দেবকুমার দাস। (সম্পা.) *দশরূপক* । কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৭।(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

_____। (সম্পা.) *দশরূপক* । কলকাতা: সদেশ, ২০১২।(চতুর্থ প্রকাশ)।

গোপ, যুধিষ্ঠির। *সাহিত্যদর্পণ* । কোলকাতা: শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর। (সম্পা.) *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* । কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.) *নাট্যশাস্ত্র* । চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪।(পঞ্চম মুদ্রণ)।

_____। (সম্পা.) *নাট্যশাস্ত্র* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১৮।(সপ্তম মুদ্রণ)।

মজুমদার, মোহিতলাল। *সাহিত্যবিচার* । কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৮৭৯ শকাব্দ।(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত। (সম্পা.) *সাহিত্যদর্পণ* । কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

_____ । (সম্পা.) *সাহিত্যদর্পণ* । কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩।(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ইংরাজি

Basu, Ratna and Karunasindhu Das. (ed.) *Aspects of Manuscriptology*. Kolkata: The Asiatic Society, 2016. (Rpt.).

Bhattacharya, J.N. and Nilanjana Sarkar. *Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit Literature.* Vols. I,II,III. Delhi: Global Vision Publishing House, 2004.

Chakravarti, Ranabir. Eloquent Inscription on Indic Experiences of State Society, Material Milieu and Religious Complexes: Integration vis-à-vis Appropriation (c. 700-1600 CE) in The Medieval History Journal, 21,1 (2018): pp 141-160 A Review Essay of the book Medieval Religious Movements and Social Change. (ed.) Noboru Karashima.

Chattopadhyay, Rita and Bijoya Goswami. *Encyclopaedia of Ancient Indian Dramaturgy.* Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2015.

Chaturvedi, Sarojini. *A Short History of South India.* New Delhi: Samskriti, 2005.

Devi, K.K. Malathi. *Prahasanas in Sanskrit Literature and Kerala Stage.* Delhi: Nag Publishers, 1995.

Garg, Ganga Ram. *International Encyclopaedia of Indian Literature.* Vol. I. Delhi: Mittal Publications, 1987. (1st ed. 1982).

Karashima, Noboru. *History and society in South India.* New Delhi: Oxford University Press, 2001.

_____. *A Concise History of South India.* New Delhi: Oxford University Press, 2017. (4th ed.; 1st ed. 2014).

Mukhopadhyaya Govindagopal. *A New Tri-Lingual Dictionary.* Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2002.

Nilakanta, K.A. *A History of South India.* Madras (Chennai): Oxford University Press, 1992.(11th ed.).

_____. *The Illustrated History of South India.* New Delhi: Oxford University Press, 2009.

Wilson, Horace Hayman *Theatre of the Hindus.* Vol. I. New Delhi. Asian Educational Services, 1984.

অন্তর্জালসূত্র

http://archive.org/details/Dhurtasamagama1958AnthologiaSanscritica/page/n5

http://archive.org/details/dhrtasamgama00jyotuoft/page/n1

http://ignca.nic.in/Sanskrit/dhurta_samagama.pdf

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Jyotirishwar_thakur